দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭২ বর্ষ, ২০ সংখ্যা।। ২০ জানুয়ারি, ২০২০।। ৫ মাঘ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। সাধারণতন্ত্র দিবস বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা

৭২ বর্ষ ২০ সংখ্যা, ৫ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২০ জানুয়ারি - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

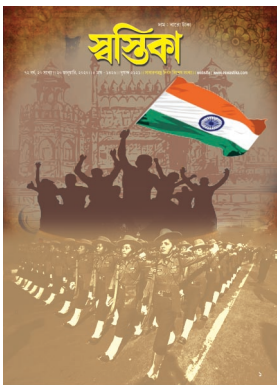

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

এই অসভ্যতার নাম বামপন্থী রোমান্টিকতা ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

আগুনে মিশলেন 'অগ্নিশর্মা', সাংবাদিকতায় 'অসীম'শূন্যতা ▯ পিনাকপাণি ঘোষ ▯ ৭

প্রতিবাদের রোমাঞ্চ ঝুঁকিপূর্ণ, পড়ুয়াদের সতর্ক থাকা উচিত ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ৮

বিদ্যাসাগর-নির্মাণ : পরিকল্পিত মিথ্যাচার ▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ১০

ভারতের রাষ্ট্রীয়তা ▯ ড. মনমোহন বৈদ্য ▯ ১৩

ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কর্তব্য — প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব ▯ বিমলশঙ্কর নন্দ ▯ ২৩

আমাদের সংবিধান ও নাগরিক কর্তব্য ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ২৬

পশ্চিমবঙ্গের ধাতুশিল্পের লৌকিক রূপ ▯ চূড়ামণি হাটি ▯ ৩১

ইতিহাসে উপেক্ষিত বেণুসাগর ▯ কৌশিক রায় ▯ ৩৩

'স্বচ্ছ ভারত' এক মহৎ মিশন ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ৩৫

নাগরিক সংশোধন আইনের বিরোধিতা করে ভোটব্যাঙ্ক ফিরে পাওয়ার রাস্তা খুঁজছে বিরোধীরা ▯ বিনয় সহস্রবুদ্ধে ▯ ৩৬

গল্প : পরিবর্তন ▯ কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৭

সত্তরতম গণতন্ত্র দিবসে জনগণের কর্তব্য ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯

সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০ ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯

স্মরণে : ৪৫ ▯ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭, ৪৯**

প্রকাশিত হবে ২৭ জানুয়ারি ২০২০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৭ জানুয়ারি ২০২০

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বারুদের স্তূপে পশ্চিমবঙ্গ?

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ কতটা নিরাপদ? উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার দেবকে তথাকথিত বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত্যু, আতঙ্ক। তারপরই নৈহাটির গঙ্গার ধারে বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে যে বিস্ফোরণ ঘটে তা যেন পোখরানের পরমাণু বিস্ফোরণের মতোই ভয়ঙ্কর। প্রায় ছয় কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে বিস্ফোরণের তীব্রতা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে এই বিস্ফোরণ এবং এতগুলি মৃত্যু কি পশ্চিমবঙ্গের আবহমান তোষণবাদী রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নয়? পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ও প্রশাসন বিস্ফোরণের পিছনে লুকিয়ে থাকা কোনো ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র লুকোনোর চেষ্টা করছে না তো? স্বাস্তিকার আগামী সংখ্যা এইসব প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই। থাকবে এই বিষয়ে বিশিষ্ট লেখকদের প্রতিবেদন।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সংবিধানের মৌলিক কর্তব্য এবং দেশবাসীর দায়িত্ব

ভারতীয় সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দশটি মৌলিক কর্তব্য উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককে সংবিধানকে মান্য করিতে হইবে, সংবিধানের আদর্শ, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে হইবে, ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন এবং রক্ষা করিতে হইবে ইত্যাদি। দশটি মৌলিক কর্তব্যের ভিতর মাত্র দুইটি উল্লেখ করিবার কারণ রহিয়াছে। কারণ এই দুটি কর্তব্যের ভিতরই নিহিত রহিয়াছে ভারত রাষ্ট্রকে এক এবং অখণ্ড রাখিবার শক্তি। এবং দুর্ভাগ্যের যে, নিছক সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে এই দেশের নাগরিকদেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কর্তব্যকে অস্বীকার করিতে চাহিতেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বলিয়াছেন, 'অধিকার এবং কর্তব্য পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া চলে। আমাদেরও ভাবিতে হইবে সংবিধানে উল্লিখিত কর্তব্যগুলি আমরা কীরূপে পালন করিব।' অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। বাম, অতিবাম এবং নেহরুপন্থীরা দেশের অভ্যন্তরে যে অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করিতেছে, যেভাবে সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যগুলিতে অস্বীকার করিতেছে—তখন, এই পরিস্থিতিতে সংবিধানের এই অংশটি বিশেষভাবে দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উগ্র বামপন্থী ছাত্র-ছাত্রীরা দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিবার আওয়াজ তুলিয়াছে। ভারতের চিরকালীন অঙ্গ কাশ্মীর এবং মণিপুরের মতো প্রদেশকে ভারত হইতে 'আজাদ' করিবার হুমকি দিয়াছে। দেশবিরোধী জঙ্গি সন্ত্রাসীদের সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছে। তাহাদের এই সমস্ত কর্মই দেশের সংবিধানের মৌলিক কর্তব্যের পরিপন্থী। দেশের অখণ্ডতা এবং ঐক্য নষ্ট করিবার প্রয়াস তাহারা করিতেছে। ইহার অধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই উগ্র বামপন্থীদের প্রতি নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছে কংগ্রেস-সহ বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের কিছু দল। ইহারই পাশাপাশি কিছু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাংবিধানিক কর্তব্যকে অস্বীকার করিবার প্রবণতা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনকে নিজ রাজ্যে কার্যকর করিতে দিবেন না বলিয়া তাহারা কার্যত দেশের আইন ব্যবস্থাকেই অস্বীকার করিতেছেন। অথচ সংবিধানে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যাহার ভিতর আইনসভাও পড়ে, তাঁহাকে মান্যতা দিতে হইবে।

যাহারা এইভাবে প্রতিনিয়ত সাংবিধানিক কর্তব্যগুলি পালনে অসম্মত হইয়া প্রকৃতপক্ষে দেশের সংবিধানকেই অসম্মানিত করিতেছেন—সংবিধান সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান এবং সচেতনতা লইয়াই প্রশ্ন জাগে। যদি তাহারা অজ্ঞতাবশত এইরূপ কাজকর্ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতেই হইবে, অবিলম্বে তাহাদের সংবিধানের পাঠ লওয়া আবশ্যক। নতুবা তাহারা অচিরেই অজ্ঞ, বালখিল্য, রাজনৈতিক বোধবুদ্ধিহীন বলিয়া বিবেচিত হইবেন। কিন্তু যদি বুঝা যায়, যথেষ্ট সচেতনভাবেই তাহারা সংবিধানের মৌলিক কর্তব্যকে অস্বীকার করিতে চাহিতেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবেই ভারতীয় সংবিধানকে অমান্য করিতে চাহিতেছেন, তখন তাহাদের সম্পর্কেও রাষ্ট্রকে কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করিতে হইবে। একটি দেশের নাগরিক পরিচয়ে সেই দেশেরই সংবিধানকে অমান্য করা আর যাহা হউক দেশপ্রেমের পরিচয় নয়। যারা এই কর্ম করেন তাহাদের এক কথায় দেশদ্রোহীই বলে। এই মুহূর্তে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য সংবিধানের মৌলিক কর্তব্যগুলি সম্পর্কে সচেতন হইয়া কে দেশের প্রকৃত গণতন্ত্রপ্রেমী নাগরিক, আর কে নয়—তাহা চিহ্নিত করা। সাধারণতন্ত্র দিবসে দেশবাসীর কাছে ইহাই গুরুত্বপূর্ণ কর্ম বলিয়া বিবেচিত হউক।

সুভাষিতম্

উপাধ্যাৎ দশ আচার্যঃ আচার্যাণাং শতং পিতা।

সহস্রংতু পিতৃন্ মাতা গৌরবেণ অতিরিচ্যতে।।

আচার্য উপাধ্যায়ের চেয়ে দশগুণ শ্রেষ্ঠ হন। পিতা শত আচার্যের সমান। মাতা পিতার চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি শ্রেষ্ঠ।

অসভ্যতার নামই বামপন্থী রোমান্টিকতা

বিশ্বামিত্র-র কলম

দেশবাসী সেদিন অন্য এক বাঙ্গলার রূপ প্রত্যক্ষ করলেন, যা বাঙ্গালির পক্ষে খুব গর্বের নয়। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তাঁরই দেশের একটি অঙ্গরাজ্যে পদার্পণ করেছেন। মূল উদ্দেশ্য পরের দিন বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বেলুড় মঠে এক অনুষ্ঠানে যোগদান। নিতান্ত অরাজনৈতিক কার্যক্রমেও কার্যক্ষেত্রে এক কদর্য দৃশ্য দেখা গেল, একদল লোক মাঠে নামলো কালো পতাকা, কালো বেলুন নিয়ে সিএএ-বিরোধী কালো ব্যাচ পরে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়া হলো, রাস্তা আটকে যাত্রীদের হেনস্থাও করা হলো। ফেসবুকে এয়ারপোর্ট ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হয়েছিল। এই নক্কারজনক অসভ্যতা, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি না মানার যে প্রত্যক্ষ রেওয়াজ সেদিন তৈরি হলো, তাতে অতিথি বৎসল কলকাতার ছবিটা মলিন হলো অবশ্যই। এই অসভ্যতাকে নানা ভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা হচ্ছে।

প্রধান ও জনপ্রিয় ব্যাখ্যা হলো দেশের যুবসমাজ পথে নেমেছে, বাম আন্দোলনের রোমান্টিসিজম ফিরে এসেছে। শেষোক্ত বিন্দুটির দিকে খেয়াল করুন। বাম আন্দোলনের রোমান্টিসিজমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাটা বিলক্ষণ ধরা পড়বে, আর এই রটনার মূলে কারা আছে, তারা কোন আদর্শে দীক্ষিত, তাদের অ্যাজেন্ডায় টাকা জোগায় কারা সেসব আর নতুন করে বলার দরকার নেই, এই স্তম্ভের পাঠকেরা অনেকবার সেসব শুনেছেন। একটা বিশেষ অংশের ছাত্র আন্দোলনকে মদত জোগানো হচ্ছে, তার বাইরেও দেশের বৃহত্তম ছাত্র-সমাজ আছে। তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কারোকে সরব হতে দেখেছেন?

সর্বভারতীয় স্তরে যাওবা হচ্ছে, বাঙ্গলায় বিশেষ প্রতিষ্ঠান বাদে বৃহত্তর ছাত্রসমাজের কণ্ঠস্বর একপ্রকার স্তব্ধ। কারণটা সবাই জানে, ৩৪ বছরের বামজমানায় মেধাবী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যে মধ্যমেধার চাষ শুরু হয়, সরকারি স্তরে সর্বত্র পার্টি-অনুগত করার যে চেষ্টায় শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড একপ্রকার ভেঙে দেওয়া হয়, পরবর্তী জমানায় সেটিই নৈরাজ্যের চেহারা নিয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে যে দল ও মতাদর্শ ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে, তাদের এই অসভ্যাতা প্রদর্শনের সাহস ও শক্তি আসে কোত্থেকে? কোনও সন্দেহ নেই, এর চরম মতাদর্শধারীরা (এক্সট্রিমিস্ট) আজ রাজ্যের শাসকদলকে সুকৌশলে ব্যবহার করছে, আর শাসক-নেত্রী তাঁর রাজনৈতিক অপরিণামদর্শিতায় নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিচ্ছেন।

কিছুদিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি প্রচার খুব চলছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের বা বিজেপি সরকারের সমর্থক (আক্রমণের এখন নতুন ভাষা হয়েছে 'চাড্ডী' বা 'ভক্ত') কিংবা আরএসএসের লোক দেখলেই তাড়ান, মারুন, কদর্য গালাগাল দিন, আরও যা যা ছোটোলোকামি করা যায় সবই করতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। সেই 'চাড্ডী' বা 'ভক্ত'দের অসীম সহনক্ষমতা বলতে হবে, গত লোকসভায় ১৮টি আসন জেতার মতো যাদের বিপুল জনসমর্থন, তারা মাঠে নামলে এই 'চান্স নিয়ে দেখা' বুলি আওড়ানো মাধ্যমিক- উচ্চমাধ্যমিকের থার্ড ডিভিশনদের আর খুঁজে পাওয়া যেত না কিন্তু তাঁদের অসীম সংযম এযাত্রা এদের বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করায় এককালে বিবেকানন্দকে বেকার যুবক বলা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মৃগী রোগী বলা বিকৃতমস্তিষ্ক বিদেশি আদর্শের দালালদের উত্তরপ্রজন্মের গালাগালের সামনে রামকৃষ্ণ মিশন পড়ছে বটে, কিন্তু হঠাৎ এরা একটু যেন রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ 'ভক্ত' হতে চাইছে, সুতরাং সাধু সাবধান। দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর দেশের অঙ্গরাজ্যে এসে পরিকল্পিত হেনস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন, শুধু ভোটযুদ্ধে জয়ই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজনে প্রশাসনিক- প্রতিরক্ষামূলক কড়া পদক্ষেপও দরকার। কারণ নরেন্দ্র মোদী কোনও দলীয় প্রধান নেতা নন, তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অপমান প্রকারান্তরে দেশকেই অপমান, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ রাখলে চলবে না। এই দেশদ্রোহীদের চিহ্নিত করা জরুরি, 'গণতান্ত্রিক অধিকার'-এর মোড়কে দেশবিরোধিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

আগুনে মিশলেন অগ্নিশর্মা, সাংবাদিকতায় 'অসীম' শূন্যতা

পিনাকপাণি ঘোষ

বড়োদেরকে সকলেই বড়ো চোখে দেখেন। কিন্তু ছোটেদেরও বড়ো চোখে দেখার মানুষ কম হয়। সেই দুর্লভ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন অসীম মিত্র। সকলের মধ্যে গুণ দেখার 'অসীম ভালোবাসা' ছিল অসীমদার সম্পদ। কখনও কারও নিন্দা ছিল না তাঁর গলায়। শাসন ছিল। কিন্তু তাতে রাগ ছিল কখনও।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা বিভাগে পড়িয়েছেন। সেই পড়ানোটাও ছিল ভালোবাসায় ভরা। খুব বেশি বিষয়কেন্দ্রিক না থেকে গল্পে গল্পে সাংবাদিকতার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করাই যেন তাঁর লক্ষ্য। আর গল্পেরও কোনও শেষ নেই। আসলে অনেক কাজের অভিজ্ঞতাই তাঁর গল্পের ভাণ্ডার ভরে দিয়েছিল। শিবরাম চক্রবর্তীর স্নেহভাজন অসীম মিত্রও ছিলেন রসিক চূড়ামণি। কখনও কখনও ছাত্র-শিক্ষক দূরত্ব অতিক্রম দ্বিধা করতেন না।

আজকাল পত্রিকায় তাঁর একটা কলাম ছিল 'ক্রেতা সাধারণ' নামে। সেই কলামে ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক লেখা লিখতেন। সেই সুবাদে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁর জানা শোনাও ছিল অনেক। ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক আইন সম্পর্কেও ছিল জ্ঞান। আর সেই জ্ঞান ও যোগাযোগ শুধু লেখার কাজে না লাগিয়ে অনেককে পরামর্শ দিয়েছেন নানা সময়ে। কীভাবে কোনও ক্রেতা সুবিচার পেতে পারেন সে ব্যাপারেও তাঁর উদ্যোগ ছিল সমান।

সংগঠন, সাংবাদিকতা এই দুই-ই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। আর এই দু'টি কাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় ফারাক রেখেই চলেছেন বরাবর। একের সঙ্গে আর এককে মিলতে দেননি। আবার একের পরিপূরক করে তুলেছেন অপরটিকে। সংগঠনের কাজে যেমন একজন সাংবাদিকের সমস্ত গুণাবলী প্রয়োগ করতেন তেমনই সাংবাদিকতার

ক্ষেত্রেও অসীমদার ভূমিকা ছিল একজন সংগঠকের মতো। তাঁর সঙ্গে কাজ করা সকলেরই জানা সেই সব। বয়স হয়েছিল। নানা অসুস্থতাও ছিল। কিন্তু তাতেও দমে থাকেননি কখনও। কাজের বাইরে থাকেননি কখনও। একেবারে শেষের কটা দিন বাদ দিলে নানা কাজেই নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন সদা হাস্যময় মানুষটা।

সুবক্তা অসীমদার অবাধ বিচরণ ছিল ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি সব ক্ষেত্রে। জানার খিদেও ছিল খুব। ছোটেদের কাছেও কুণ্ঠাহীন গলায় প্রকাশ করতেন কৌতূহল, সোজাসুজি বলতেন, ''আমার জানা নেই, তুমি একটু বুঝিয়ে দাও।''

স্বস্তিকা পত্রিকায় একটা বড়ো সময় ধরে 'অগ্নিশর্মা' নামে কলাম লিখতেন। বেশ কিছুটা সময় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আর দায়িত্বের বাইরে চিরকাল ছিলেন অভিভাবকের মতো।

এটা মানতেই হবে যে, অসীম কুমার মিত্র একেবারে অন্যধারার সাংবাদিকতার সাধনা করে গেলেন অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে। জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী থেকে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা করাটা পশ্চিমবঙ্গে এক ধরনের অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। অসীম কুমার মিত্র প্রথম এই অপরাধ জগতে পা রেখেছিলেন সেই ছয়ের দশকে। পরবর্তী পাঁচ দশক তবুও সমাদৃত থেকেছেন এবং একই সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী হিসেবে লড়াই করে গেছেন দরিদ্রতার সঙ্গে। একজন সৎ সাংবাদিকের যা নিশ্চিত পরিণতি। যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকতার পরিবেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাঁরা জানেন যে একই সঙ্গে পেশাদার সাংবাদিক এবং আরএসএস-এর একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক— এই দুইয়ের মাঝে কী বিস্তর সংঘাত এবং সংকট। এই আতঙ্কে অনেকেই তাঁদের পরিচয় গোপন করে টিকে থাকার চেষ্টা করেন। অসীমদার ক্ষেত্রে এমনটির বালাই ছিল না। যুগান্তর বা আজকাল— অসীমদা ছিলেন চরম আরএসএস, কিন্তু চরম পেশাদার সাংবাদিক। তাই গৌরকিশোর ঘোষ বা অশোক দাশগুপ্ত, সম্পাদকদের কাছে শ্রদ্ধারই পাত্র ছিলেন অসীম কুমার মিত্র। ছিলেন আস্থাভাজনও।

একই সঙ্গে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক, যোগ্য সাংবাদিক, সফল সংগঠক, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং আপাদমস্তক সততার প্রতীক। এতগুলো পরিচয় নিয়ে শুধুই সেবা করে গেলেন অসীমদা। ব্যক্তিগত স্তরে অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যায় অসীমদার স্মৃতিচারণায়। কিন্তু একটা দুটো ঘটনা নয়, অসীম কুমার মিত্র পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকতায় একটা সংগ্রাম। বিরুদ্ধ পরিবেশের মাঝে মাথা উঁচু করে টিকে থাকার সংগ্রাম। অর্থের অভাবের মধ্যেও সততার সঙ্গে আপোশ না করার সংগ্রাম। অনেক উচ্চ পদে আসীন হওয়া সত্ত্বেও পদের অপব্যবহার না করার সংগ্রাম। আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে পেশাদার থাকার সংগ্রাম। এবং একা, একদম একা এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া দশকের পর দশক।

অসীম কুমার মিত্র বহু মানুষের হৃদয়ে থেকে যাবেন একজন আদর্শ সাংবাদিক হিসেবে। ■

প্রতিবাদের রোমান্স ঝুঁকিপূর্ণ, পড়ুয়াদের সতর্ক থাকা উচিত

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

সাম্প্রতিক সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা নিদেনপক্ষে সংবাদ বিতরণকারী যে কোনো মাধ্যমে চোখ রাখলে বা কান পাতলেই এক ধরনের তীব্র বিরক্তির উদ্রেক হচ্ছে নয়তো-বা তুমুল উত্তেজনার অনুভূতি ঘিরে ধরছে। এই ক্ষুরধার সংবাদপ্রবাহ কিন্তু একটা বিষয়ে সাহায্য করছে তা হলো অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে ঝালিয়ে নেওয়ার। প্রত্যেক প্রজন্মেরই সময়কে নতুনভাবে যাচাই করার প্রবণতা দেখা যায়, আবার অনেক সময়ই সে প্রচেষ্টায় অতীতের ভুলগুলিরই পুনরাবৃত্তি হয়। অবশ্যই মনুষ্য জীবনের এ-ও এক অভিজ্ঞতা যাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

মাসখানেক বা তার কিছু আগে যখন থেকে দেশের এক শ্রেণীর লোক ভারতীয় নাগরিকত্বের মধ্যে অসাধারণ কিছু গুণাবলী হঠাৎই আবিষ্কার করল তারই সমান্তরালভাবে ছাত্রদের মধ্যেও আচমকা এনিয়ে তৎপরতা উৎসাহ দেখা দিল। যদিও এই পড়ুয়া-বিক্ষোভে বাড়তি ভূমিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে যাদের সন্দেহ করা গিয়েছিল ঠিক তারাই প্রথম দর্শন দেয়। যেমন জেএনইউ, যাদবপুর বা আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। তারা বরাবরের মতো আবার প্রমাণ করেছে যে তারা প্রচণ্ড অশান্ত ও হিংস্র প্রতিবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু কিছুটা অবাক হওয়ার ও উদ্বেগের কারণটা হলো, এই ধরনের বিক্ষোভের একটা ছোঁয়াচে চরিত্র আছে। এর হাতেনাতে প্রমাণ পেলাম যখন শুনলাম আমার শিক্ষা শুরুর দিনের দিল্লির St. Stephen's College-এর ছাত্ররা ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশটি ভালো করে পাঠ করার জন্য একদিনের ক্লাস বয়কট করেছে।

কলেজের Allnutt Lawn-এ পৌঁছে সেখানে 'আজাদি'র কী মহিমা তা তারস্বরে ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে একটি শব্দই আমার মাথায় আসছে তা হলো উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনা আমাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ১৯৭৫ সালের একটি অতীত প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে আমাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ রাত্তির অবধি বিভিন্ন ক্লাসে ঘুরে ঘুরে জয়প্রকাশ নারায়ণকে দেওয়ার জন্য টাকা তুলছিলাম। কেননা জয়প্রকাশ নারায়ণের পরের দিন সকালেই মউরিস নগরে এক সভায় বক্তৃতা করার কথা ছিল।

কিছুটা অবাক করে দিয়েই বহু সংখ্যক ছাত্রই ১ টাকা বা ২ টাকা করে সেদিন দিয়েছিল। ভাবা যায় তখনকার দিনে সাকুল্যে ২০০ টাকার মতো এক রাজকীয় অঙ্কের টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে ১৯৭০ সাল নানা কারণেই ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। সে সময় চরমপন্থী কোনো ভাবধারা লালন করা ছিল যথেষ্ট fashionable। এই চিন্তার উৎসে ছিল একটি আন্তর্জাতিক স্রোত। সে সময় ভিয়েতনামে আমেরিকার জড়িয়ে পড়া নিয়ে পাশ্চাত্যের বহু বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্রদের এক ধরনের উত্থান শুরু হয়। এই পটভূমিতে আসার St. Stephens-এ ঢোকার কয়েক বছর আগেই বেশকিছু নিঃসন্দেহে অতি উজ্জ্বল ছাত্র আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী নিয়ে এতটাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল— বিশেষ করে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা লোটাকম্বল নিয়ে ট্রেন ধরে বিহারে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে তারা সরাসরি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। সেখান থেকে কোনো অভিযান পরিচালনা করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। দুর্ভাগ্যবশত যে গরিব কৃষকদের মঙ্গলার্থে তাদের এই যাত্রা তারাই 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' এই স্লোগান শুনে হতিচকিত হয়ে তাদের উন্মাদ বা ভূতগ্রস্ত বলে তেড়ে যায়। এই বিপ্লবীরা হতোদ্যম হয়ে ফিরে আসে। অনেকে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে যায়। পড়াশোনায় মন বসানো দূরস্থান, অনেকে অবসাদে এক বছর ড্রপ পর্যন্ত করেছিল।

এই St. Stephens-এর 'নকশাল'রা যথেষ্ট ভাগ্যবান ছিল। এদের বেশিরভাগেরই অভিভাবকরা মোটামুটি কেষ্টবিষ্টু হওয়ায় যথোপযুক্ত যোগাযোগ ঘটিয়ে বড়ো কোনো গাড্ডায় পড়া থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সির যে সমস্ত পড়ুয়া fascist রাজ্য-শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন তাঁরা অতটা ভাগ্যশালী ছিলেন না।

এঁদের মধ্যে অনেকে 'এনকাউন্টার'-এ নিহত হয়। আবার অনেকেই বহু বছর জেলের ভয়ংকর পরিবেশের মধ্যে অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়। এদের সকলেরই ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যায়। উলটো দিকে সাধারণ ছাত্রদের ওপরও এর রেশ পড়ে। অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ থাকায় পড়াশোনার অপূরণীয় ক্ষতি হয়। বারবার পরীক্ষা পিছিয়ে যেতে থাকে। অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের শিক্ষা বিলম্বিত হয়ে পড়ে। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সেই যে মুখ থুবড়ে পড়ে তারপর সেই অস্থিরতা থেকে আর সেভাবে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

ছাত্রদের এই লাগামছাড়া অতি সক্রিয়তার মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা এক জটিল ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে লেনিনের পর্যবেক্ষণ যে শ্রমিকশ্রেণীই হবে বিপ্লবের ধ্বজাধারী, তারাই হবে উদ্‌গাতা এই তত্ত্ব বর্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা খারিজ করে দিয়েছেন। পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাঁদের উপলব্ধি যে প্রবল 'ভোগবাদ' শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব করার আন্তরিক

তাগিদটাই ধ্বংস করে দিয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে তারা আর এসবে উৎসাহী নয়। তারা বর্তমানে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। এই কারণে এখন বিপ্লবী পরিবর্তন আনার দায় বর্তেছে ছাত্রদের ওপর। এই বিপ্লবী ছাত্ররা তথাকথিত অত্যাচারিত সংখ্যালঘুদের সঙ্গে নিয়ে বিপ্লব ত্বরান্বিত করবে।

এখানেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে লক্ষণীয়, ৬০-এর দশকের শেষভাগের বামপন্থীদের কার্যকলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে আজকের ভারতে আবার মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে। বাম মহাপণ্ডিতরা আজ তাদের সেই বিপ্লবী নামধারী অধরা ঈশ্বরকেই যেন প্রত্যক্ষ করছেন এই বিক্ষোভরত ছাত্রদের মধ্যে। এদের মধ্যেই সঠিক বিরোধী রাজনৈতিক দলের অভাবে তাঁরা 'fascist' মোদী সরকারের উপযুক্ত লড়াকু বিপ্লবী অবতার আবিষ্কার করেছেন। দলিত ও মুসলমানদের মতো অত্যাচারিত সংখ্যালঘুদের নিয়ে এই ছাত্ররাই নাকি সংবিধানের সেই হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করবে। একই সঙ্গে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষয়কেও তারাই আটকাবে। আশা বহুবিধ।

বলা বাহুল্য, এবারও এই কৌশল পশ্চিম থেকেই আমদানি হয়েছে। আমেরিকায় ডেমোক্রেটিক দলের বামপন্থার দিকে বাড়তি ঝোঁক, অন্যদিকে ব্রিটেনে লেবার পার্টির বামমুখীনতাই এখানকার বামনেতাদের ইন্ধন জুগিয়েছে। পড়ুয়ারা সব বিষয়েই তাৎক্ষণিক উত্তেজনা খোঁজে। চলতি ধারা থেকে সরে গিয়ে নিজেকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে তুলে ধরার মানসিকতা থেকেই বিকল্প জীবনযাপনের ধরন অনুসরণ তাদের আকর্ষণীয় মনে হয়। কেননা সাময়িকভাবে তা কিছুটা মাদকতাময়।

পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ চালানোর মধ্যে নিশ্চিত এক ধরনের বীরত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। তাছাড়া আজকের আধুনিকতা-উত্তর (Post modern) বিশ্ব সংক্রান্ত কোনো জ্ঞান চলতি রাজনীতিকদের অতি ক্ষীণ। অনেক সময় তা নেই বললেই হয়। এমনটাই তারা মনে করে। শুধু তাই নয়, অনেক সময়ই 'কবিতার মাধ্যমে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা মিটিয়ে দেওয়া যায়' এমন এক আত্মম্ভরি বিলাসও তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। যার ফলে তারা ভিন্নমত পোষণকারীদের পাক্কা গাড়ল ভাবতে ভালোবাসে।

প্রতিবাদের একটা নিজস্ব রোমান্স তো আছেই। তবে সমস্যাটা হচ্ছে এই তো প্রথম নয়, এই প্রকৃতির বিক্ষোভ অতীতেও চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়েছিল মোহভঙ্গ শেষে তজ্জনিত আক্রোশ। লেনিন যা বলেছিলেন, বড়ো কোনো খেলায় নামতে গেলে এই ধরনের কিছু 'প্রয়োজনীয় গাড়লদের'ও (useful idiots) দরকার পড়ে। ধীরে হলেও এ বিষয়ে যতই আত্মোপলব্ধি হবে মানসিক তিক্ততা তত দ্রুত বাড়বে।

সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এর একটা হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কে জানে, আমরা হয়তো সেই সংঘাতময় পরিস্থিতির অনভিপ্রেত সাক্ষী হতে চলেছি। ▮

বিদ্যাসাগর-নির্মাণ : পরিকল্পিত মিথ্যাচার

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

সম্প্রতি একটি পত্রিকায় অধ্যাপক শীতাংশু চক্রবর্তী একটি প্রবন্ধ ('ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ এবং মূল্যবোধ : নিকট দিগন্তে কালো মেঘ') লিখেছিলেন ২০১৩ খ্রি. জুলাই সেপ্টেম্বর। সে লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে আশীষ লাহিড়ী তীব্র সমালোচনা মূলক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন : 'দীর্ঘ রবীন্দ্রনাথ, খর্ব ঈশ্বরচন্দ্র'।[১] শীতাংশু চক্রবর্তী দেখেছেন পশ্চিমি ভাবাদর্শের আরোপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যা ক্রমে ভারতের চিরন্তন মূল্যবোধ থেকে টেনে নামিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। এর ফলে তাঁকে ভারতীয় সমাজ, আদর্শ, দেশচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে। ফলে মূল্যবোধ হ্রাস পাচ্ছে। পাশাপাশি, রবীন্দ্রনাথকে অধ্যাপক চক্রবর্তী বিদ্যাসাগরের তুলনায় অনেক দীর্ঘ করতে চেয়েছেন। আশীষবাবু গণ-বিতান আন্দোলনের মানুষ। তাঁর মতে, শীতাংশুবাবু সমাজে বিদ্যাসাগরের শাশ্বত হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত মূল্যবোধকে অস্বীকার করার প্রবণতাকেই একালে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে পুষ্ট (পড়ুন দরকচা মার্কা বামপন্থী মার্কসবাদী মতে নিষ্ঠ) গোষ্ঠী বিদ্যাসাগরকে বড়ো করে তুলছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে অরবিন্দ বিদ্যাসাগরর মতো শাশ্বত ভারতীয় হিন্দু সংস্কারের বিরোধিতা করেননি। আমাদের মনে হয় বিতর্কটি অবান্তর। বিদ্যাসাগরকে ভারতীয় শাশ্বত মূল্যবোধের বাইরে স্থাপন করা মূঢ়তা ছাড়া কিছু নয়। তা তিনি ছিলেন না। অধ্যাপক চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলেছেন— 'কোন মূল্যবোধের প্রেরণায় এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষটিকে নিয়ে হঠাৎ এত আলোড়ন?' তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যান অনুযায়ী এর কারণ তিনটি : ১. তিনি ইংরেজ সরকারকে বেদ-বেদান্ত, হিন্দু-শাস্ত্রাদি যে ভ্রান্ত, সেকথা জানিয়েছিলেন। ২. 'বোধোদয়ে' প্রথমে পদার্থ, পরে ঈশ্বর সম্পর্কে লিখেছেন। এবং ৩. বিধবা বিবাহ আন্দোলনে তিনি পুরোধা ছিলেন।

পাশাপাশি আশীষবাবু এই যুক্তিগুলি অস্বীকার উদ্দেশ্যে পণ্ডশ্রম করে ওই প্রবন্ধ লিখেছেন। আবার বলি, বিদ্যাসাগর মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে পাশে রাখার দরকার নেই। যাঁরা সমাজ-সংস্কারক শিক্ষাবিদ ঈশ্বরচন্দ্রকে পূজনশীল যুগস্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথের তুলনা করছেন— তাঁরা দুজনকেই মর্যাদা দিচ্ছেন না। বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এসব বিতর্ক উদ্দেশ্যমূলক বলে পরিহার্য।[২]

বিদ্যাসাগর বেদান্ত ও শাস্ত্রাদিকে মিথ্যা ভাবতেন, একে অবান্তর বলে মনে করি। ১৮৫৩, সেপ্টেম্বর ৭, তখনকার সম্পাদক : শিক্ষা দপ্তর, এফ. জে. ওয়াট-কে বিদ্যাসাগর যে চিঠি লিখেছিলেন, তার একাংশে আছে : বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্য-দর্শনকে তিনি মিথ্যা দর্শন মনে করেন! 'These systems false they are, command unbounded reverence from the Hindus'[৩] শুধুমাত্র এই বাক্যাংশ থেকে যাঁরা দেখতে চান বিদ্যাসাগর দর্শন হিসেবে বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্য-কে অকিঞ্চিৎকর— মিথ্যা দর্শন বলেছেন— তাঁরা এই চিঠির অন্য অংশ পড়ে দেখেছেন নিশ্চয়। এই পত্রের প্রসঙ্গ ছিল সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন সংক্রান্ত। ড. ব্যালান্টাইন লিখেছেন তিনটি বই— সেই তিনটিকে পাঠ্য হিসেবে নির্বাচনের প্রস্তাব এসেছিল। বিশপ বার্কলের পক্ষ থেকে ছিল চাপ। বিদ্যাসাগরের ভাষায় 'Inquiry'-র উত্তরেই মূল্যায়ন করেছিলেন তিনি। বই তিনটি যথাক্রমে— ১. 'বেদান্তসার', ২. 'তর্কসংগ্রহ' ও ৩. 'সত্ত্বসমস'। বিদ্যাসাগরের মতে তৃতীয় বইখানি সাংখ্য দর্শনের ভাষ্য হিসেবে 'are very poor treatises in their own departments'। অস্যার্থ, সাংখ্য দর্শনের পক্ষপাতীদের তুলনায় এই ভাষ্য যথাযথ নয়। হিন্দুরা যাকে প্রথম শ্রেণীর দর্শন ভাবে (command unbounded reverences), শ্রদ্ধা করে— ড. ব্যালান্টাইনের উক্ত তিনটি গ্রন্থ সেই তুলনায় যথাযথ নয় বলেই ভ্রান্ত পদ্ধতি (false system) ভাবা হয়েছে কিনা বিশেষ করে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা বিদ্যাসাগর ছাত্রপাঠ্য বইয়ের ভালো-মন্দ বুঝতেন। তিনি এসবের পঠনপাঠন বাদ দিতে চাননি। চিঠিতেই আছে : 'Of these the 'Vedantasara', text book on Vedanta, is already a class book here and it version in English might be read with advantage.' সুতরাং বিদ্যাসাগরের চিঠি আসলে কোনো দর্শন বিষয়ে আপত্তি বা আসক্তি হিসেবে দেখা উচিত নয়। ড. ব্যালান্টাইনের বইগুলি যাতে সংস্কৃতে কলেজের ছাত্রদের পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হয় সে ব্যাপারে বইগুলির ভূমিকায় লেখা ছিল আর্চ বিশপ হোয়ার্টলি 'strongly recommends'! সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা সংস্কৃত ভাষাতেই সর্বদর্শন পাঠ করতেন সন্দেহ নেই। সহায়ক পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে সাহেবদের চাপ সৃষ্টিকে অস্বীকার করার সাহস দেখিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। এখান থেকে একটি অংশ তুলে মিথ্যার চক্র ঘুরে চলেছে! একে বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদ বলা চলে না।[৪]

বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের আসক্তি ছিল না। তাকে তিনি মিথ্যা দর্শন বলে ঘোষণা করেননি। ২০ জানুয়ারি ১৮৫৮-তে দি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে 'বিবলিও থেকা ইন্ডিকা' সিরিজে ৬৩ ও ১৪২ সংখ্যক প্রকাশনী হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদনা করেন মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন সংগ্রহ'। এই গ্রন্থের ভূমিকা (তখন বলা হতো 'বিজ্ঞাপন') বিদ্যাসাগর লিখেছেন, 'It contains short notices of all the systems of Indian Philosophy, and as such is very valuable.'[৫] এখানে ভারতীয় দর্শনের কোনো অংশ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই। বরং বেদ-শাস্ত্র সম্পর্কে আগ্রহীদের এই গ্রন্থ যে জরুরি সে ব্যাপারে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রন্থে বেদ-বিরোধী চার্বাক দর্শনের কথা সবার শেষে আছে। তা থেকে কিছু বিচিত্রমনা পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে চার্বাকপন্থী সাজিয়েছেন! জনৈক চার্বাক বিশেষজ্ঞ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের কথা বলেছেন এক প্রাবন্ধিক। তাঁর ভাষা : 'এই বইটির হাত

ধরেই চার্বাক দর্শন চর্চা নবজীবন লাভ করেছে। ...আজ দেশবিদেশে যেখানেই চার্বাক চর্চা হয়, তার আধার কিন্তু বিদ্যাসাগর সম্পাদিত ওই 'সর্বদর্শন সংগ্রহ'।'[৬] বিচিত্র যুক্তিই বটে। বিদ্যাসাগর সম্পাদনা করলেন বেদ-বিশেষজ্ঞদের কাছে সুপরিচিত ('well known scholar of the vedas'-এর টীকাকার) মাধবাচার্যের গ্রন্থ। লিখলেন, এখানে আছে ভারতীয় দর্শনের সব কটি প্রস্থানের ভাষ্য : 'treatise of so much importance'[৭] আর সেজন্য তিনি বেদ বিরোধী চার্বাক দর্শনের প্রবক্তা হয়ে গেলেন! পরে অবশ্য ওই প্রাবন্ধিক বুঝেছেন, বিদ্যাসাগর মশাই চার্বাক দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন--- এর সপক্ষে কোনো স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় না।'[৮] রবীন্দ্রনাথ এধরনের প্রজ্ঞাকে 'ধানের খেতে বেগুন খোঁজা' বলে বিবেচনা করেছিলেন।[৯] অথচ সবাই মিলে দশচক্রে ভগবান ভূত হবার উপক্রম হয়েছে। বিদ্যাসাগরকে অধার্মিক, নাস্তিক বলে ধরে নিয়েছি আমরা। তাঁকে বড়োজোর অজ্ঞেয়বাদী বলতে পারি। তুবও বলবো, এনিয়ে শেষ কথা বলার সময় আসেনি।

১৮৬৬-তে ২৫ ভাদ্র (সম্ভবত আগস্ট-সেপ্টেম্বর), ১৯২৩ সংবৎ 'বোধোদয়'-এর ঊনসত্তরতম সংস্করণ প্রকাশ পায়; তারপর ১৮৮২-তে প্রকাশিত ঊনআশিতম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ২২ পৌষ ১৯৩৯ সংবৎ।[১০] মধ্যবর্তী ১৬ বছরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহু পাঠক শুভানুধ্যায়ী ভদ্র লোকের পরামর্শ পেয়ে 'বোধোদয়'-এর সংশোধন করেন।[১১] খুব সম্ভবত এইসব পরামর্শ মেনে নিয়েই বিদ্যাসাগর বোধোদয়ে সন্নিবেশ করলেন 'ঈশ্বর' সম্পর্কে বিশেষ অনুচ্ছেদ। সেখানে আছে :

'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহার দাতা ও রক্ষাকর্তা।'[১২]

'বোধোদয়ে'র প্রথম অনুচ্ছেদ 'পদার্থ'। এ থেকে জড়বাদী মহান আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মেধাবীদের আনন্দের সীমা নেই। তাঁদের ধারণা ঈশ্বর-অনুচ্ছেদটি পরে রাখার মাধ্যমে তাঁরা মনোমতো বস্তুবাদী- বিদ্যাসাগর নির্মাণের চেষ্টা করছেন। অথচ 'বোধোদয়ে'র পরবর্তী অনুচ্ছেদ কি তাঁরা পড়ে দেখেছেন? 'চেতন পদার্থ' অনুচ্ছেদে যখন তিনি লিখেছেন :

'পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না, মুখ আছে খাইতে পারে না,... ইহার কারণ এই পুত্তলিকা জড় পদার্থ; উহার চেতনা নাই; ঈশ্বর কেবল প্রাণীদিগকে চেতনা দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কাহারও চেতনা দিবার ক্ষমতা নাই।'[১৩]

অজ্ঞতা ভালো নয়। অজ্ঞের পাণ্ডিত্যাভিলাষ অত্যন্ত মন্দ।

পুত্র শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে ৩১ শ্রাবণ ১২৭৭ বঙ্গাব্দে যে চিঠি লিখেছিলেন তা অতি বিখ্যাত। বিশেষত বস্তুবাদী পাঠশালায় বিদ্যাসাগর-নির্মাণে এই উদ্ধৃতি বেশ আকর্ষণীয় বটে। বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন :

'...আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক হইবে, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।'[১৪]

ব্যক্তিজীবনে দেশাচারের বিরুদ্ধে ছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন, তাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার সময় তিনি দেশের মানুষের যুক্তিকে পাশ্চাত্য যুক্তি বিধানের মাধ্যমে অস্বীকার করেননি। সংস্কৃত শাস্ত্র বিচারের মাধ্যমেই তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করেছেন। যদি বলি, দেশাচারকে অবলম্বন করে দেশাচারকে আঘাত দিতে চেয়েছিলেন— নিশ্চয় ভুল হবে না।

শাস্ত্র স্মৃতি অবলম্বন করেই 'বাল্যবিবাহের দোষ' নিবন্ধে তিনি জানিয়েছেন, ৮ বৎসরের বালিকাকে দান করাকে বলা হতো 'গৌরীদান'; ৯ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে দান করলে তা ছিল 'পৃথ্বীদান' আর ১০ বৎসরের বালিকাকে পাত্রস্থ করলে দাতার পবিত্র লোকপ্রাপ্তি' হতো। এর পর 'বাল্যবিবাহের দোষ'— দর্শন করে তিনি সখেদে লিখেছেন, 'হায়! জগদীশ্বর আমার দিনের দুরবস্থা হইতে কতদিনে উদ্ধার করিবেন।'[১৫] এই জগদীশ্বর কি কথার কথা, না দেশাচারকে অবলম্বন করা? পাঠক বিবেচনা করবেন।

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত পত্র ব্যবহারে প্রায়ই ঈশ্বর, দেব-দেবীর শরণ, মঙ্গল কামনা রয়েছে। একটি সারণি রচনা করছি।

সূচনায় 'শ্রীশ্রী হরিঃ শরণম্' আছে

১. জননীকে লেখা ১২ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ বঙ্গাব্দের পত্রে।

২. স্ত্রী দিনময়ী দেবীকে লেখা (একই দিনে লেখা পত্র)।

৩. পিতাকে লেখা ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ বঙ্গাব্দের পত্র।

৪. পুত্রবধূ ভবসুন্দরী দেবীকে লেখা ১ চৈত্র ১২৮৫ বঙ্গাব্দের পত্র।

৫. পৌত্র প্যারিমোহনকে লেখা ২৭ পৌষ ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পত্র।

৬. প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারীকে লেখা ১৫ মাঘ ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পত্র 'শ্রীশ্রী হরিশরণম্' আছে।

৭. পিতাকে লেখা একটি তারিখবিহীন পত্রে 'শ্রীশ্রী হরি' আছে।

৮. পুত্র শম্ভুচন্দ্রকে লেখা ২১ মাঘ (বছর অনুল্লেখিত)

এর পত্রে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'-এর চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপনে আছে বেশ কিছু সমর্থক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা। সংখ্যায় তাঁরা বেশি ছিলেন না, কিন্তু দেশের প্রচলিত আচারের বিরুদ্ধে তাঁরা দাঁড়িয়ে মেধা ও বিদ্যা প্রয়োগ করেছিলেন। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম লিখছি :

১. শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য।[১৬]

২. শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য; তিনি ছিলেন সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ধর্মশাস্ত্রের 'ভূতপূর্ব অধ্যাপক'। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র ঘেঁটে ৬টি প্রমাণ দিয়ে বিধবা বিবাহের সমর্থন করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর গ্রন্থে এগুলি সন্নিবেশ করেছেন।[১৭]

৩. শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য 'আদিপুরাণ' তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখিয়েছিলেন একটি শ্লোক সুনির্দিষ্ট ভাবে 'পরাশরভাষ্যে' আছে।[১৮]

৪. এছাড়া নানা ভাবে সাহায্য করেন— ছাত্র রামকমল ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন।[১৯]

ভারতীয় পুরাণ-শাস্ত্র-স্মৃতি অবলম্বন করে দেশাচারকে অবলম্বন করে দেশাচারের

বিরুদ্ধতা করেছেন বিদ্যাসাগর। সুতরাং একটি পত্রের বাক্যাংশ অবলম্বনে যাঁরা বিদ্যাসাগর-নির্মাণ করেন তাঁদের চেষ্টাকে অন্ধের হস্তীদর্শন ছাড়া কী বলা যাবে?

দেশবাসী বিধবার বিবাহ দিতে চাইতেন না, শাস্ত্রসম্মত কিনা তা জানা ছিল না। এজন্যই বিদ্যাসাগর নানা শাস্ত্র অবগাহন করে দেখলেন সত্যযুগে মনু, ত্রেতাযুগে গৌতম, দ্বাপরে শঙ্খ লিখিত ওই স্মৃতি গ্রাহ্য। কলিযুগে পরাশর সংহিতা গ্রহণ করতে হবে।[২০] অকাল বিধবা মহিলাদের জন্য তখনকার নিদান ছিল মাত্র দু'টি। ১. ব্রহ্মচর্য, ২. সহগমন। রাজা রামমোহন রায় সহগমন নিবারণের প্রয়াস করে সফল হন। বিদ্যাসাগর অন্য নিদানটিকে নানা ভাবে অস্বীকার করলেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণের বিষয়টি এক হিসেবে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা ছিল। জীবন্ত (অধিকাংশ অনিচ্ছুক) মহিলাদের শ্মশানে চিতায় তুলে দেওয়া দেশাচার ছিল না শুধু, ছিল অত্যন্ত ফৌজদারি অপরাধ। ব্রহ্মচর্যের নামে বিধবাদের তুষানলে পুড়িয়ে মারা হতো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি অবশ্যই বিধবাবিবাহ প্রচলন। এই কাজে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে দেশাচার মানুন বা না মানুন— সামাজিক স্তরে দেশাচারকে অবলম্বন করে অস্বীকার করেছেন। এই নিষ্ঠা, পরিকল্পনা, চরিত্র বল আমাদের দেশে বিরল।

অনুসঙ্গ :

১. 'অন্তঃ সার'; ২০১৪; সম্পাদক : রত্নাংশু বর্গী। সাউথ গড়িয়া; দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৭৪৩৬১৩।

২. কথাটি লিখলাম, কারণ 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীসঙ্ঘ', সোনারপুর থেকে 'সংবীক্ষণ' নামক সংকলনে (২৭তম) ২০১৯ আশীষবাবুর লেখাটি পুনর্মুদ্রণ করেছেন। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, বিতর্কটি চলমান রাখা।

৩. 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী' : অখণ্ড সংস্করণ, কামিনী প্রকাশনালয়; কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ (১৯৯৯ খ্রি.); ৫৫০ পৃ.।

৪. চিঠিখানি সম্পূর্ণ পড়লে উৎসাহী পাঠক আরও বহু তাজ্জব করার মতো খবর পেতে পারেন। উক্ত আর্চ বিশপ হোয়ার্টলি আর ড. ব্যালান্টাইন চেয়েছেন সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত বই পড়া হোক ইংরেজি ব্যাখ্যা সহ। আর এমনকী কোরান ইত্যাদিকে পড়াতেও চেয়েছেন তারা! এ নিয়ে অন্য কোনো প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

৫. 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী'; উক্ত; ৪১১ পৃ.।

৬. প্রজ্ঞা পারমিতা : 'বিদ্যাসাগর : প্রসঙ্গ দর্শন ও জীবন দর্শন'; 'সংবীক্ষণ'; উক্ত; ৫৯ পৃ.।

৭. 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী'; উক্ত।

৮. প্রজ্ঞা পারমিতা : উক্ত; ৬৩ পৃ.।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ভারতবর্ষ ও স্বদেশ'; 'রবীন্দ্র রচনাবলী', জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১; ১০২৭ পৃ.।

১০. 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী', উক্ত; ১১৫৩ পৃ.।

১১. এঁদের মধ্যে ছিলেন তখনকার ত্রিপুরা জেলার 'রুপসা' গ্রামের রিডিং ক্লাব'-এর 'কার্যদর্শী শ্রীযুক্ত মহম্মদ রেয়াজউদ্দিন মহাশয়' এবং কলকাতার 'শ্রীযুক্তবাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ ডাক্তার মহাশয়'। তদেব।

১২. তদেব; ১১৫৪ পৃ.।

১৩. তদেব।

১৪. ইন্দ্র মিত্র : 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.; কলকাতা, ১৯৯৭ : ৩০০ পৃ.।

১৫. 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী'; উক্ত; ৫৫৫ পৃ.।

১৬. তদেব; পরে বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেছেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য তাঁকে ৭টি প্রমাণ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তদেব; ৫৬২ প.।

১৭. তদেব; ৫৬১-৫৬২ পৃ.।

১৮. তদেব; ৫৬২-৫৬৩ পৃ.।

১৯. তদেব; ৫৬৩ পৃ.। ছাত্র রামগতি ন্যায়রত্ন মারা যান অকালে। স্নেহাতিরেকে এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকটি বাক্য লিখেছেন। এখানে অপ্রয়োজন বলে উদ্ধৃত করছি না।

২০. শ্লোকটি ছিল :

কৃতে তু মানবা ধর্মস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতয়ঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পরাশরাঃ স্মৃতাঃ।।
—'বিদ্যাসাগর রচনাবলী'; উক্ত; ৫৭০ পৃ.।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

আবেদন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বর্গত প্রচারক বসন্তরাও ভট্টের কর্মজীবন সংবলিত একটি গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বসন্তদার সান্নিধ্যে যাঁরা কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা তাঁর জীবনের বহু প্রেরণাদায়ী মুহূর্তের সাক্ষী রয়েছেন। সেই সব ঘটনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলে তা বর্তমান প্রজন্মের কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকদের প্রেরণাস্বরূপ হবে। সেজন্য এরকম কার্যকর্তা বা স্বয়ংসেবকদের লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। লেখার সঙ্গে নিজের পরিচয়, ঠিকানা ও ফোন নং দিতে হবে। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, ২০২০।

—ভবদীয়—

অদ্বৈতচরণ দত্ত
অঃ ভাঃ সহ প্রচারক প্রমুখ
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

বিশ্বনাথ বিশ্বাস
সভাপতি
পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

লেখা পাঠাতে হবে

সুদীপ তেওয়ারী
কার্যালয় প্রমুখ কেশব ভবন
৮২৪০৯২১৫৪৪

বাসুদেব পাল
কল্যাণ ভবন
৯৬৭৪৫১৪৯৫২

গজানন বাপট
পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম
৯৪৩৩৯৮৮৯৪৫

basudebp421@gmail.com

ভারতের রাষ্ট্রীয়তা

ড. মনমোহন বৈদ্য

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই বামপন্থী ঘরানার এক প্রবীণ সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন— 'কংগ্রেসের অবস্থা কেন এমন হয়েছে?' এটা একটি অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন ছিল। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম--- 'কংগ্রেসের পুরো নাম কী?' তিনি এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিছুটা ভেবে বললেন--- 'ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস।' আমি বললাম— 'ভারতীয়র অর্থ তো হলো 'সম্পূর্ণ ভারতব্যাপী' আর 'ভারতের জন্য'। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শব্দের অর্থ কী?" তিনি কিছু বলতে পারলেন না। আমিই আগবাড়িয়ে বললাম ভারতীয় পরিভাষায় রাষ্ট্র শব্দের অর্থ হয় 'সমাজ'। ভারতীয় সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য হাজার হাজার বছরের পরম্পরার কারণে তার পরিচিতি নির্মাণ হয়ে গেছে। এই পরিচিতিকে অক্ষুণ্ণ রাখা ও পুষ্ট করার অর্থ হলো ভারতীয় হওয়া। প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পর কংগ্রেস ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়। তখন কংগ্রেসের সমস্ত নেতা রাষ্ট্রীয় ভাবধারার ছিলেন। এই রাষ্ট্রের অর্থাৎ ভারতের পরম্পরাগত সমাজের বিশেষ পরিচিতি যা শত শত বছরের যাত্রার কারণে নির্মাণ হয়েছে এবং বহু আক্রমণ ও সংঘর্ষের পরও টিকে রয়েছে, তার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের সেইসব নেতা গর্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

ভারতীয় চরিত্রের চারটি লক্ষণ :

ভারতীয় সমাজের একটি ভাবাত্মক আদর্শ রয়েছে, যার ভিত্তি হলো আধ্যাত্মিক। এই কারণে হাজার হাজার বছরের ঐতিহাসিক যাত্রার সময়কালে ভারতের এক চরিত্র নির্মাণ হয়েছে এবং এই আধ্যাত্মিকতার কারণে তার প্রকৃতিও নির্মাণ হয়েছে। ভারতের বিশাল ও ভৌগোলিক ক্ষেত্রে বসবাসকারী জনসমুদায়, বিভিন্ন জাতি-পন্থ- ভাষার নামে পরিচিত এই সম্পূর্ণ সমাজ ভারতের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সজ্জিত করে রেখেছে।

ভারতীয় চরিত্রের চারটি দিক রয়েছে। প্রথম, 'একম্ সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'। ঈশ্বরের নাম এবং তাঁর কাছে পৌঁছনোর পথ আলাদা আলাদা হলেও তা এক ও সমান। ভারত তার আচরণের দ্বারা এটি প্রমাণ করেছে। এজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর চিকাগো ভাষণে বলেছিলেন যে, আমরা কেবল অন্য ধর্মাবলম্বীর মত সহ্য করি তা নয়, আমরা সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি, স্বীকার করি। তিনি আরও বলেন, 'সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজি 'এক্সক্লুশান' শব্দটির কোনোমতে অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।' দ্বিতীয় দিক হলো, বৈচিত্র্যের মূলে যে ঐক্য তাকে অনুভব করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ''বহুর মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন— ইহাই ভারতের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এই জন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এই জন্য সকল পন্থাকে সে স্বীকার করে, স্বস্থানে সে সকলেরই মাহাত্ম্য দেখিতে পায়। ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব।... তবে ভারতবর্ষের মধ্যে যে মৃত্যুহীন একটি শক্তি আছে, তাহার সন্ধান পাইব।" তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, ভারত বিশ্বাস করে নারী বা পুরুষ প্রত্যেকেই ঈশ্বরের অংশ। আর মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হলো তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে সুপ্ত দেবত্বকে প্রকাশ করা। এরজন্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চার পুরুষার্থের কল্পনা ভারত করেছে। এখানে অর্থ ও কামের নিষেধ নেই। ধর্মসম্মত পথে তার পূর্ণ উপযোগ করে 'মুক্ত' থাকাকে এখানে পরিপূর্ণ অথবা সার্থক জীবন বলে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ দিক হলো, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির মুক্তিলাভের পথ অন্বেষণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। আমার রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে আমি কর্মপথ, ভক্তিপথ, ধ্যান অথবা জ্ঞানপথের যে কোনো একটি অথবা সবগুলিই একসঙ্গে গ্রহণ করতে পারি। আমার ইচ্ছা, রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে এই চারটি পথই গ্রহণ করার স্বাধীনতা ভারত আমাকে দিয়েছে। এজন্যই এখানে, ভারতে আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র রয়েছে বলা হয়।

কথাবার্তায় যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল তা হলো ভারত, তার পরিচিতি, তার স্বরূপ এবং রাষ্ট্র শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

ধর্মই ভারতের প্রকৃতি :

ভারতের প্রকৃতি হলো ধর্ম। এই ধর্ম 'রিলিজিয়ন' অথবা উপাসনা পদ্ধতি নয়। নিজের অনুভূতির বিস্তার করে, আপনত্বের সীমা বিস্তৃত করে, যাকে একান্ত নিজের (যে রূঢ়ার্থে নিজের নয়) মনে হয়, তার জন্য, তার ভালোর জন্য কিছু করাই হলো ধর্ম। কোনো চিহ্ন ধারণ করা, কোনো বিশেষ পরিচিতি বহন করা বা তার প্রদর্শন করাই ধর্ম নয়; বরং প্রত্যক্ষ কাজ করা, সেই অনুসারে আচরণ করাকে আমাদের এখানে ধর্ম বলা হয়েছে। এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে— মন্দিরে যাওয়া, বিগ্রহের পূজা করা,

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

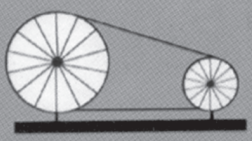

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

ব্রত রাখা ইত্যাদি ধর্ম নয়; এগুলি উপাসনা। উপাসনার ফলে ধর্মাচরণ করার শক্তি উৎপন্ন হয়। এজন্য বলা হয় উপাসনা 'ধর্মের জন্য'; ধর্ম নয়। ধর্ম সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতি আপনত্ব বোধ শেখায়। ধর্মের এই ধারণাটি ভারতের নিজস্ব। ভারতের প্রতিটি ভাষায় অভিজাত ও লোকসাহিত্যে এর বিপুল বর্ণনা রয়েছে। ভারতের বাইরের কোনো ভাষায় ধর্মের সমার্থবোধক শব্দ নেই। এজন্য ইংরেজিতে বলার সময় 'ধর্ম' শব্দেরই প্রয়োগ করা ঠিক হবে। একে রিলিজিয়ন বললে ভুল হবে। উপাসনা পদ্ধতিকে রিলিজিয়ন বলা যেতে পারে।

চোখ খুলুন এবং 'আমি'-কে ছোটো করুন, তাহলে 'আমরা'-র পরিধি বড়ো হয়ে যাবে। এই 'আমরা'-র পরিধি বড়ো হতে হতে আমি বিলীন হয়ে আমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, গ্রাম, জেলা, রাজ্য, দেশ, মনুষ্য সমাজ, পশু-পক্ষী, প্রকৃতি-পরিবেশ, সম্পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হয়ে যাবে।

ঈশাবাস্যমিদং সবং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।।

এই ভাব ও অনুভূতির মূল হলো আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক আপনত্ব। গাছপালা, বন্যপ্রাণী সমস্ত কিছু আমাদের নিজের বলে মনে হয়। এটা এই ভাবনার অভিব্যক্তি।

বিদ্যার্থীদের শিক্ষা দেওয়া, তৃষ্ণার্তকে জল দেওয়া, ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়, রোগীকে চিকিৎসা দান— এ সবই ধর্মীয় কাজ মনে করা হয়। এজন্য ধর্মশালা, ধর্মার্থ হাসপাতাল ইত্যাদি শব্দের প্রচলন হয়েছে। তীর্থস্থানে জলাশয়ের ঘাট নির্মাণ, জলাশয় নির্মাণ, রাস্তার ধারে গাছ লাগানো, শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষকে সহায়তা দান— এসব কর্তব্য কর্মকে ধর্ম বলা হয়। এজন্য ধর্মের এক পরিভাষা কর্তব্য বা দায়িত্ব করা যেতে পারে। ধর্ম মানে ভেদভাব না করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা।

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, যে সমাজে লোকেরা নিজের পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত অর্থ নিজের কাছে না রেখে সমাজহিতে দান করেন, সেই সমাজ একত্রিত অর্থের শক্তিতে সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হয়। ফলস্বরূপ, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু যে সমাজে লোকেরা তাদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ সমাজহিতে দান না করে নিজের কাছেই রেখে দেয় সেই সমাজের কিছু লোক সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হলেও সমাজ দরিদ্রই থেকে যায়।

সহায়তা করার সময় যদি ভেদভাব এসে যায়, তা 'ধর্ম' হতেই পারে না। ধর্ম সমাজকে সংযুক্ত করে, সংযুক্ত করে রাখে। এজন্য ধর্মের আর একটি পরিভাষা হলো 'যা ধারণ করে রাখে, তাই 'ধর্ম'। বলা হয়েছে— 'ধারণাদ্‌ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্মো ধরায়তে প্রজাঃ'। সমাজ থেকে আমরা যা কিছু গ্রহণ করি, তার চেয়ে বেশি সমাজকে প্রদান করলে ধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্রের প্রার্থনায় এক শ্লোক রয়েছে— 'জীবনে যাবদাদানং স্যাৎ প্রদানং ততোঽধিকম্। ইত্যেষা প্রার্থনাস্মাকং ভগবন্ পরিপূর্যতাম।।' অর্থাৎ 'জীবনে যা কিছু গ্রহণ করি, তার চেয়ে অধিক যেন সমাজে প্রতিদান করতে পারি। হে ভগবান! আমাদের এই প্রার্থনা পূরণ কর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে স্পষ্ট বলেছেন যে, কল্যাণকারী রাজ্য ভারতীয় ধারণা নয়। তিনি বলেছেন, যে সমাজ নিজের আবশ্যকতার জন্য রাজ্যের ওপর যত কম নির্ভর করে থাকে তাকে স্বদেশি সমাজ বলা হয়। এজন্য ভারতে সামাজিক উদ্যোগ ও সামাজিক অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। এর ব্যবস্থা 'ধর্ম' করে চলেছে। এজন্যই আমাদের সমাজ ধর্মাধিষ্ঠিত ছিল এবং থাকবে; ধর্মনিরপেক্ষ নয়।

ধর্মচক্র প্রবর্তনায় :

ভারতের সংবিধান তৈরির সময় সংবিধান সমিতির সদস্যদের এই 'ধর্ম' শব্দটির যথাযথ ধারণা ও জ্ঞান ছিল— এটি পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে। এজন্য ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের ধ্যেয়বাক্য 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ', সংসদভবনে 'ধর্মচক্র প্রবর্তনায়', রাজ্যসভায় 'সত্যং বদ ধর্মং চর' লেখা রয়েছে। শুধু এগুলিই নয়, আমাদের জাতীয় পতাকায় যে চক্র অঙ্কিত রয়েছে তা 'ধর্মচক্র'। চক্র ঘূর্ণায়মান হয়ে থাকে। অর্থাৎ সতত ভ্রমণশীল প্রত্যেক ব্যক্তির 'ধর্ম' আচরণ করা, সমস্ত সমাজ এক, আমার নিজের— এই ভেবে কোনো প্রকার ভেদভাব না করে সমাজকে দিতে থাকা একান্ত আবশ্যক। ধর্মচক্রকে ঘূর্ণায়মান রাখতে সহযোগিতার জন্য প্রতিটি কাজ তা ছোটো- বড়ো যাই হোক না কেন প্রত্যেককে এই কাজ করতেই হবে।

১৯৮৮-তে গুজরাটের কিছু অংশে ভীষণ আকাল পড়েছিল। তখন আমি ভদোদরা জেলা প্রচারক ছিলাম। আকাল-পীড়িত এলাকায় পাঠানোর জন্য প্রত্যেক বাড়ি থেকে 'সুখড়ী' (এক প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য) সংগ্রহ করে সঙ্ঘ কার্যালয়ে জমা করা হচ্ছিল। একদিন লাঠিতে ভর দিয়ে এক বৃদ্ধা ভিখারিনি ওখানে আসে। সেখানকার কার্যকর্তারা যখন তাকে এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে তখন অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে সে বলে 'সুখ-ড়ী'। কার্যকর্তারা তাকে বলে যে, এই সুখড়ী দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষদের কাছে পাঠানোর জন্য, এখানকার লোকের জন্য নয়। তখন সেই বৃদ্ধা তার পরনের কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা পুঁটলি বের করে দিতে দিতে বলে, 'বেটা! আমি নিতে আসিনি, দিতে এসেছি।' সে তার সারাদিনের ভিক্ষার থেকে কিছুটা সুখড়ী বাড়িতে তৈরি করে দিতে এসেছিল। এরকম ছোটো ছোটো কাজের দ্বারা ধর্ম পরিপুষ্ট হয়। ধর্মচক্র সচল থাকে।

কয়েক বছর আগে তামিলনাড়ুর তিরুপুর শহরে 'সক্ষম' সংস্থার উদ্যোগে কেন্দ্র সরকারের সহযোগিতায় দিব্যাঙ্গ সহায়তা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। 'সক্ষম' দিব্যাঙ্গদের জন্য কাজ করা সঙ্ঘ অনুপ্রাণিত একটি সংগঠন। দিব্যাঙ্গদের সহায়তা এবং কিছু উপকরণ দেওয়ার জন্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সহায়তা প্রদানের আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ চলছিল। অসংখ্য দিব্যাঙ্গ ভাই-বোন বাসগুমটি থেকে আসছিল। তাদের নিয়ে আসা এক অটোচালক ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখতেই তার সহানুভূতি জাগ্রত হয়ে পড়ে। তারপর থেকে সে সারাদিন শিবিরে আসা-যাওয়ার জন্য দিব্যাঙ্গদের থেকে কোনো ভাড়াই নেয়নি।

রাষ্ট্রের হিন্দু হওয়া :

ভারতের মতাদর্শগত অধিষ্ঠানের

BANSIDHAR BADRIDAS MODI PRIVATE LTD

EDEN HOUSE

17/1, LANSDOWNE TERRACE

LANSDOWNE MANOHAR PUKUR CROSSING

KOLKATA - 700026

OWNERS : SREE SIBBARI T.E

HEAD-OFFICE

P.O - DIBRUGARH, ASSAM

With best Compliments from :

তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিনপুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ (৫।৪৬)

BHARAT STEEL INDUSTRIES

190, Girish Ghosh Road, Belurmoth, Howrah

Pin- 711 202

কারণেই তার চরিত্র ও প্রকৃতি নির্মাণ হয়েছে। সারা বিশ্ব একে 'হিন্দুত্ব' নামে জানে। এজন্য ভারতের, ভারতীয় সমাজের অর্থাৎ এই রাষ্ট্রের পরিচিতি 'হিন্দু' হিসেবে। এই অর্থে এই সমাজ হিন্দুরাষ্ট্র। এই হিন্দুত্ব সবাইকে নিয়ে চলা, সবাইকে যুক্ত করা, কারো সঙ্গে ভেদভাব করা নয় এবং ভবিষ্যতেও এরকমই থাকবে। হিন্দুত্ব এই রাষ্ট্রের বিশেষণ। হিন্দুত্ব সমস্ত ভারতীয়ের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ব্যবসায়িক এবং সামাজিক জীবনে অভিব্যক্ত হওয়া, সহজ আচরণে আনা অর্থাৎ এই রাষ্ট্রের 'হিন্দু' হওয়া। সামাজিক সমৃদ্ধিকে বৃদ্ধি করে তার বিনিয়োগ কোনো প্রকার ভেদভাব না করে সমস্ত অভাবগ্রস্ত লোকের জন্য হবে— এরকম ধর্মসম্মত আচরণ করাই হিন্দুরাষ্ট্র হওয়া। আমাদের পূর্বপুরুষ, বীরপুরুষ, সমাজ সংস্কারক এবং সাধুসন্তদের কারণে বহু আক্রমণ ও সংঘর্ষের সম্মুখীন হওয়া এই রাষ্ট্রীয় প্রবাহ অবিরত চালাতে থাকা, তার সম্মান করাই 'হিন্দু' হওয়া।

ভারতের পবিত্র ভূমিতে যে শ্রেষ্ঠ দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে, দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, দৃঢ় হয়েছে এবং যে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে সেই ভারতভূমিকে মাতৃস্বরূপা মনে করে তাকে ভক্তি করাই 'হিন্দু' হওয়া। এই কাজ কোনো রাজনৈতিক শক্তি বা সরকারের নয়। এই কাজ এই সমাজের প্রত্যেক সন্তানের। 'সর্বেঽপি সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ।।' এই 'অপি'-তে বালক- বালিকা, যুবক-বৃদ্ধ, রুগ্ন, দুর্বল, গুণহীন সবাই রয়েছে। এরা সবাই সুখী হোক— এর গ্যারান্টি ধর্ম দিয়ে থাকে। এর আচরণ প্রত্যেককে করতে হবে।

ব্যক্তির রাষ্ট্রীয় হওয়া :

এই ভারতের সম্পূর্ণ সমাজ এক, আমার নিজের। সবাই সমান এবং আমাকে আমার সমাজকে কর্তব্যবোধে নিজের মনে করে দিয়ে যেতে হবে— এরকম ভাবনা ও আচরণ করার অর্থ হলো হিন্দু হওয়া অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় হওয়া। আমরা হিন্দু হওয়ার কারণে এই সমাজ হিন্দুরাষ্ট্র। এটি কালাতীত সত্য। আমাদের হিন্দুরাষ্ট্র বলার এটাই অর্থ। এতে কারো ক্ষোভ অথবা অপমানিত হওয়ার, কাউকে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা, বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি অনুসরণকারী এই যে ভারতের রাষ্ট্রীয় সমাজ, আমরা সবাই এক, বিবিধতায় বিভেদ সৃষ্টি না করা আমাদের বৈশিষ্ট্য— এটি মেনে নিয়ে পৃথিবীতে আনন্দ, সৌহার্দ্য ও সামঞ্জস্যের সঙ্গে বছরের পর বছর বেঁচে আছে।

যাতায়াত ও বার্তা প্রেরণের আধুনিক উপকরণের কারণে এখন বিশ্ব খুবই নিকটে এসে গেছে। বিশ্বে ভাষা, বংশ, উপাসনা (রিলিজিয়ন) পদ্ধতির বিবিধতা থাকবেই। এই বিবিধতার মূলে যে ঐক্য তা দেখার দৃষ্টি ভারতের রয়েছে। কারণ, 'ঈশাবাস্যমিদং' ভারতের ধ্যেয়বাক্য। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' এবং 'মা গৃধঃ' আচরণ সূত্র। এর কারণে ধর্মকে দৃঢ় করলেই সকলের সুখের ব্যবস্থা হতে পারে।

বহু শতক ধরে ভারত এভাবেই জয়লাভ করে আসছে। এজন্য ভারত 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ও 'বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম্'-এর প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারত তার হিন্দুত্বের পূর্ণ আচরণ করে এর উদাহরণ সৃষ্টি করবে যে বৈচিত্র্যময় ও বিশ্বব্যাপী মানবগোষ্ঠীর জন্য সৌহার্দ্য ও সহাবস্থানের সঙ্গে একত্রে কীভাবে বেঁচে থাকতে পারে, কীভাবে চলতে পারে। এটি ভারতের কর্তব্য এবং বিশ্বের আবশ্যকতাও বটে। এরকম ভারত নির্মাণ মানে ভারতবর্ষের বিশ্বগুরু হওয়া। শুধু ঘোষণা করলেই গুরু হওয়া যায় না, আচরণের দ্বারা তা প্রমাণ করতে হয়। এই শ্রেষ্ঠতম কাজেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ লেগে রয়েছে। এটিই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য আর তার সৃষ্টি হওয়ার কারণ। সঙ্ঘ শুরুর সময়ের একজন প্রচারক সঙ্ঘের বিষয়ে যা বলেছিলেন তা অত্যন্ত সার্থক ও অর্থবহ। তিনি বলেছিলেন, 'এই হিন্দুরাষ্ট্রের অর্থাৎ হিন্দুসমাজের জীবনোদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তাকে সক্ষম ও বিকশিত করার কাজ হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।'

রাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্রবাদী :

কিছু লোক এই 'রাষ্ট্রীয়'-কে রাষ্ট্রবাদী বলে অভিহিত করেন যা অনুচিত। 'রাষ্ট্রবাদ' শব্দ ও ধারণা ভারতীয় নয়। ষোড়শ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যে যে রাষ্ট্র ধারণাটি তৈরি হয়েছিল তা ভারতীয় 'রাষ্ট্র' ধারণা থেকে একেবারে ভিন্ন। সেখানে রাষ্ট্র হলো রাজ্যভিত্তিক এবং তারা তাদের রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করেছে, আক্রমণ করেছে, অত্যাচার করেছে, এমনকী নির্যাতন পর্যন্ত চালিয়েছে। ভারতীয় রাষ্ট্র ধারণা রাজ্যভিত্তিক নয়; সমাজভিত্তিক। এর মূলে রয়েছে এক সংস্কৃতি অথবা সমান জীবন দৃষ্টিভঙ্গি। এজন্য রাজ্য অনেক ও বিবিধ হওয়া সত্ত্বেও এই সমাজ অর্থাৎ রাষ্ট্র নিজের জীবনদৃষ্টির ভিত্তিতে সাংস্কৃতিকভাবে এক। এ কারণেই এখানে রাষ্ট্রীয়তার ধারণা পরিপুষ্ট হয়েছে; রাষ্ট্রবাদ নয়। স্বাধীনতাপূর্ব কালখণ্ডে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের বেশিরভাগ নেতা এবং অসংখ্য কর্মী 'রাষ্ট্রীয়' মনোভাবাপন্ন ছিলেন। পরে কংগ্রেসে কমিউনিজমের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে এই 'রাষ্ট্রীয়' নেতৃত্বকে কোণঠাসা করে দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস দল ভাঙনের কারণে এই প্রক্রিয়া পূর্ণ হয়ে, কমিউনিস্ট ভাবধারার পূর্ণ প্রভাবে যে কোনো উপায়ে ক্ষমতায় আসা অথবা ক্ষমতায় টিকে থাকার যাত্রা কংগ্রেসে শুরু হয়। এই সময়েই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং সাধুসন্তদের প্রয়াসে 'রাষ্ট্রভাব' জাগরণের কাজ দ্রুতগতিতে হতে শুরু করে এবং তার প্রভাব তখন সমাজে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। একদিকে 'রাষ্ট্রীয়' জাগরণের কাজ চলছিল, যার কারণে সমাজে জাতি, পন্থ, প্রান্ত, ভাষা ইত্যাদি পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভাবনা ও আচরণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, অন্যদিকে কংগ্রেস দল জাতপাত, প্রদেশ, ভাষা ইত্যাদিতে ভেদ সৃষ্টি করে, মানুষের মনোভাবনাকে বিভ্রান্ত করে, শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বা ক্ষমতা লাভের জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল।

এর ফলস্বরূপ, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস 'রাষ্ট্রীয়তা' থেকে দূরে সরে যায় এবং রাষ্ট্র জাগরণের কারণে রাষ্ট্রীয় ও জাগ্রত জনসমাজ কংগ্রেসকে একেবারে কিনারায় পাঠিয়ে দেয়। এই প্রবন্ধের শুরুতে বামপন্থী ঘরানার ওই প্রবীণ সাংবাদিক সম্পাদকের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন 'কংগ্রেসের অবস্থা কেন এমন হলো?' তার উত্তর এটিই।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ)

Rang Rez Sarees

Wholesalers of Fancy Printed
& Embroidered Sarees

45/1, Rafi Ahmed Kidwai Road

(Entrance also from 77/1/A, Park Street)

2nd floor, Kolkata - 700 016

PHONE : 2265-9147, 2265-0772 (Shop),

for Designer Super Net Sarees

JALAN JAN KALYAN TRUST

Flat No. 1A, Paramount Apartments

25, Ballygunge Circular Road

Kolkata - 700 019, TEL : 2475-6524, 2475-7760

Fax : 2475-7619, E. mail : madhuban@salyam.net.in

নাগরিকত্ব আইনের মতাদর্শগত ভিত্তি

বর্তমান ভারত সরকার যে নাগরিকত্ব আইন পাশ করিয়েছে সেটা নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানান সমালোচনা হচ্ছে এবং একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের মদতে তাণ্ডব চালাচ্ছে। তার কারণ নাকি এই আইনে শুধু মাত্র মুসলমানদেরকে বেছে বেছে বের করে দেওয়া। কিন্তু এটা কী ঠিক হবে। কথা হলো, স্বাধীনতার ৭২ বছর পর কেন এই রকম একটি আইন চালু করতে হচ্ছে? তার কোনো মতাদর্শগত ভিত্তি অবশ্যই আছে।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পরে আসে স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ঠিক অব্যবহিত পরে পশ্চিম প্রান্তে পঞ্জাব-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে পাকিস্তানের জনবিনিময় কার্যত সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তখন ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের পাশাপাশি সাধারণ মুসলমানরাও চলে যায় লাহোরে, করাচীতে। আর লাহোর, করাচী থেকে হিন্দুরা ভারতে আসেন। তাতে সম্পত্তির ক্ষয় হয়েছে, রক্ত ঝরেছে, জীবনহানিও হয়েছে। ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে অসম, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ। সেখানকার চিত্রটা কিন্তু অন্যরকম।

সেখানে স্বাধীনতার পর নানান সংঘর্ষ হয়েছে। বহু হিন্দু যারা পূর্ববঙ্গে থাকতেন তাঁরা আতঙ্কে অসমে এবং ত্রিপুরায় চলে এসেছেন। এখানকার বহু মুসলমান ভিটেমাটি ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন চতুর্দিকে প্রচণ্ড রকমের রক্তপাত হচ্ছে তখন নেহরু লিয়াকত চুক্তিতে বলা হয় যে পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতোই সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। ধর্মীয় কারণে বা অন্যান্য কারণে অত্যাচারিত হয়ে যদি কেউ পাকিস্তান থেকে ভারতে আসেন আবার ভারত থেকে পাকিস্তানে ফিরতে চান তাদের ফেরাটাকে ত্বরান্বিত করা হবে এবং তারা যাতে ঠিকভাবে ফিরতে পারেন সেক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগ নেবে। আবার এখানকার যে সমস্ত মুসলমান ঘরবাড়ি ভিটেমাটি ছেড়ে পাকিস্তান বা পূর্বপাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন তারা যদি এখানে ফিরতে চান সেক্ষেত্রে ও ভারত সরকার একই রকম পদক্ষেপ নেবেন। এটা হয়ে যাওয়ার পরেও যদি কেউ মনে করেন যে না আমি পূর্ব পাকিস্তানে থাকবো তিনি যেতে পারেন। কত সম্পত্তি বা নগদ নিয়ে যেতে পারবেন সেটা পর্যন্ত বিস্তারিত ভাবে বলা ছিল। অর্থাৎ পাকাপাকি ভাবে একটি শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক বা রক্তক্ষরণ বন্ধ হোক এটাই ছিল নেহরু-লিয়াকত চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। দুটো দেশই এই চুক্তিতে সই করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতবর্ষ সেই চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেও পাকিস্তান কিন্তু সেই চুক্তি পালন করেনি।

পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গ স্বাধীনতার সময় হিন্দু জনসংখ্যা বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে ২৭ শতাংশের কম হয়েছে। তা ক্রমশ কমে কমে ৮ শতাংশের কাছাকাছি এসেছে। আবার অন্য দিকে এই ভারতবর্ষে মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েছে। সেটা হিন্দুদের থেকেও বেড়েছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা দিনের পরদিন ধর্মীয়ভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন, ধর্ষিতা হয়েছেন, জীবন হারিয়েছেন। সুতরাং সেখানকার ভিটেমাটি হারানো, স্বজন হারানো, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ছিন্নমূল অসহায় হিন্দুরা যদি এখানে এসে থাকেন তাহলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মতানুযায়ী শরণার্থী হিসেবে তাদের নাগরিকত্ব দিতে অসুবিধা কোথায়? বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি যে দাবি তুলছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আগত মুসলমানদেরও নাগরিকত্ব দিতে হবে সেটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ বাংলাদেশে, পাকিস্তানে কিংবা আফগানিস্তানে মুসলমানরা নিপীড়নের শিকার হয়েছে এটা মানা যায় না। মুসলমানরা তো তাদের হোমল্যান্ড পেয়ে গেছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান সবইতো মুসলমান দেশ। সেখানকার সংখ্যাগুরুই তো মুসলমান। তাহলে সেখানকার মুসলমানরা কীভাবে

একটি মুসলমান দেশে অত্যাচারিত হয়? এর ব্যাখ্যা বিরোধীদের কাছে নেই। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান বলতো যে Kashmir is an unfinished agenda of partition। এখন কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার বলছে যে এই unfinished agenda-কে ফিনিশ করার তাগিদ রয়েছে আমাদের। এটাই হলো নাগরিকত্ব আইনের মতাদর্শগত ভিত্তি।

—শতদ্রু প্রসাদ প্রামাণিক,
কাকদ্বীপ, দ: ২৪ পরগনা।

সঙ্ঘশক্তি কলৌযুগে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সখা ভীমের তরফ থেকে জবাবটা দিয়েছিলেন। প্রশ্ন কর্তা হিড়িম্বা তনয় ঘটোৎকচ, পিতৃদেব ও ভগবানের চরণস্পর্শ করার সৌভাগ্য যখন হলোই, তবে আপনাদের আসতে এতো দেরি হলো কেন? শ্রীভগবান উত্তর দিলেন, —কে কখন আসবে, কখন যাবে এবং কোথায় তা বিধিনির্দিষ্ট, মানব করায়ত্ত নয়।

মহারাষ্ট্র নিবাস হলে ৪ জুন মুকুল রায়ের প্রশ্নের উত্তরে (আপনারা কী চান ২০২০ সাল পর্যন্ত মমতা সরকার থাকুক...) এটাই হতো আমার সপ্রেম নিবেদন। যদি উপস্থিত হবার সূচনা এবং জবাব দেবার সুযোগ পেতাম তবে আমার উপস্থাপন এই রকম হতে পারতো। আমি ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির সদস্য, বিজেপির সাধারণ কার্যকর্তা, অতিরিক্ত ন্যূনতম পদে নেই, তবে সকল বিষয়ে আছি। কাজেই মনের বেদনা রেখে দিই মনে।

দশবছর বয়সে অগ্রজপ্রতিম লহরদার (মেদিনীপুরের উকিল) অনুগ্রহে 'নমস্তে সদাবৎসলে মাতৃভূমে' মন্ত্র কানে পশেছিল। আজ ৬৭; এতো বছরে এই প্রত্যয় দৃঢ় হয়েছে যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের

পদ্মবেদী হচ্ছে হিন্দুত্ববাদ। অর্থাৎ 'এক ধর্মরাজ্য পাশে' সমগ্র ভারত বেঁধে দেবার মূল শক্তি হলো হিন্দুত্ব। 'হীনং দূষয়তি যঃ সঃ হিন্দু'। আমার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হরিপদ ভারতী বলতেন হিন্দুত্ববাদ সর্বখর্ব— তারে দহে। দীনদয়াল উপাধ্যায়কে দর্শন (ভাষণ শোনার ছাত্র-যুবদের সমাবেশে)-এর সৌভাগ্য একবারই হয়েছিল। তখন কলকাতায় সিপিএম-নকশাল/বিপ্লবী-অতি বিপ্লবী ধুন্ধুমার চলছে। তিনি বলেছিলেন,—'এত বিপরীত পরিবেশেও তোমরা যারা এখানে এসেছো... তোমরা থাকবে সংগঠনের ভিতের পাথরের মতো। ভিত যত শক্ত হয় প্রাসাদ এতো গগনচুম্বী হয়। লোকে চূড়ার প্রশংসা করবে কিন্তু ভিতের পাথরকে কেউ দেখতে পাবে না।

শুধু সাম্যবাদ নয়, সাম্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বমানব হতে গেলে ভারত পথিক হতে হবে'... মাথার মধ্যে এতো অক্সিজেন পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন পণ্ডিতজী, হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরেছিলাম। সেদিন ট্রামের ভাড়া বেঁচে গেছিল। বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা সেই মধুনিষ্যন্দি ভাষণ আজও মনের মধ্যে অনুরণিত হয়। ব্যক্তি নয় ব্যক্তিত্ব, অসংখ্য ব্যক্তিত্বের সম্মিলনে গড়ে ওঠে সংগঠন, জয় হয় সঙ্ঘশক্তির। মার্চ মাসের অমিতজীর বক্তব্য মনে রাখতে হবে— 'কোনো নির্বাচন কেন্দ্রে কোনো প্রার্থী পাঁচবার নির্বাচিত হয়ে থাকেন তো সেখানে পাঁচবারই জিতেছে দল, ক্যান্ডিডেট নয়। যাঁরা পরাজিত হয়েছেন তাঁরা সংগঠনের কাজে আরও মনোনিবেশ করুন। নির্বাচকমণ্ডলী বংশবাদ কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করেছেন।' ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির গবেষক মহাপণ্ডিতরা একটা কথা বলেন— পতন অভ্যুদয় বন্ধুরপন্থায় একজন চিরসারথি ইতিহাসসিদ্ধ পুরুষ আছেন।

যা হয় বা হবে তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে হবে; তিনি যেমনি বাজান ভেরী মোদের তেমনি নাচের ভঙ্গি। সংগঠনকে আরও দৃঢ় মজবুত করতে হবে। দিলীপদা- মুকুলদা নেতৃত্ব দিন, আমরা সকলে এই কাজে ব্রতী হই।

—অমিতাভ সেন,
লেক প্লেস,কলকাতা-২৯।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবন্ধের (স্বস্তিকা, ১১.১১.১৯) পরিপ্রেক্ষিতে কিছু তথ্য সংযোজনের উদ্দেশ্যে এই পত্রের অবতারণা। বল্লভভাই প্যাটেল যখন ১৯০০ সালে ওকালতি পাশ করেন, তাঁর অগ্রজ বিঠলভাই প্যাটেল সে সময় বরসাদ শহরে ওকালতি করতেন। সেখানে তাঁর পসার বেশ ভালো ছিল। তিনি বল্লভভাইকে বরসাদ শহরে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে বলেছিলেন। কিন্তু পরমুখাপেক্ষী হতে বল্লভভাইয়ের অনীহা ছিল। তিনি স্বাধীনভাবে গোধরায় ওকালতি শুরু করেন এবং দু'বছর পরে বরসাদ শহরে স্বাধীন ভাবে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন। বল্লভাই মিতব্যয়ী ছিলেন। বরসাদে প্র্যাকটিস করে তিন বছরে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাবার প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয় করে সেখানে যাবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু 'ভি. জে. প্যাটেল'-এর নাম লেখা ট্রাভেল এজেন্টের পাঠানো পত্রটি বিঠলভাইয়ের কাছে পৌঁছে যায়। বিঠলভাই সঞ্চয়ী ছিলেন না। তিনি পত্রখানি দেখে বল্লভভাইকে বলেছিলেন, বড়ো ভাইয়ের আগে ছোটোভাইয়ের ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়া ভালো দেখায় না। নীতি- নৈতিকতা এবং পরম্পরা (''By all the canons of morality and tradition") মেনে বড়ো ভাইয়ের আগে যাওয়া উচিত। 'The elder brother should go first')। বল্লভভাই তাঁর দাদাকে মান্য করতেন। তিনি দ্বিরুক্তি না করে সংশ্লিষ্ট সব কাগজপত্র এবং তাঁর সঞ্চিত দশ হাজার টাকা বিঠলভাইকে দিয়ে দিয়েছিলেন। তদুপরি তাঁকে বলেছিলেন, বিলেতে তাঁর আরও টাকার দরকার পড়লে তিনি তা পাঠিয়ে দেবেন। বিঠলভাই ১৯০৮ সালে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে বোম্বেতে প্র্যাকটিস করতেন। বল্লভভাই ১৯১০ সালের আগস্ট মাসে স্বোপার্জিত অর্থে বিলেত যাত্রা করেন এবং সেখানের Middle Temple Inn থেকে ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি Bar-AT-Law হয়ে দেশে ফিরেন। Middle Temple Inn-এর পরীক্ষাগুলি বল্লভভাই বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, যার জন্য বোম্বের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার বাসিল স্কট তাঁকে বিচারপতি পদে চেয়েছিলেন। বল্লভভাই অসম্মতি প্রকাশ করলে স্যার বাসিলের পরবর্তী প্রস্তাব ছিল যে, তিনি যদি বোম্বেতে প্র্যাকটিস করেন তাহলে তাঁকে ল' কলেজের পার্টটাইম প্রফেসর করা হবে। বল্লভভাই প্যাটেল ওইসব লোভনীয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে আমেদাবাদে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন। কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের কোনো এক বিলেত ফেরত ব্যারিস্টারকে সমঝাতে বল্লভভাই ব্যারিস্টার হবার জন্য বিলেতে পাড়ি দেননি। অগ্রজ ভ্রাতার জন্য স্বার্থত্যাগ না করলে তিনি ১৯০৮ সালেই ব্যারিস্টার হতে পারতেন। উল্লেখ্য, নিবন্ধে উদ্দিষ্ট কাশ্মীরি সম্প্রদায়ের মানুষটি ব্যারিস্টার হবার জন্য Inner Temple Inn-এ ভর্তি হয়েছিলেন ১৯১০ সালে।

নিবন্ধে বলা হয়েছে, ভুলাভাই দেশাই আই.এন.এ. বন্দিদের মামলায় ঐতিহাসিক সওয়ালের পর মামলা জেতেন। কথাটি ঠিক নয়। সামরিক আদালত বন্দিদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দিয়েছিল। তদানীন্তন সেনাপ্রধান স্যার ক্লড অকিনলেক সেই সাজা মকুব করে দিয়েছিলেন এবং বন্দিদের মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি সামরিক আদালতের সিদ্ধান্তকে ভুল বলেননি; তাঁর বিবেচনা ছিল, ''...the findings of the Court Martial were in conformity with the evidence, but the accused were not found guilty of any gross brutality...।" সেই কারণে, অকিনলেক অভিযুক্ত তিন বন্দিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সাজা ঘোষণা হয়েছিল ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৫-এর বন্দিরা মুক্ত হয়েছিলেন ৩ জানুয়ারি, ১৯৪৬।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

নারীমুক্তি মানে আত্মসুখ নয়

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

আমরা যখন অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখি যে আমাদের গ্রাম, শহরতলী এবং শহরের মহিলারা দৈনন্দিন জীবনে কত কাজ করতেন! যেমন গোরুর দুধ দোওয়া থেকে আরম্ভ করে তার খাবার জল, স্নানের ব্যবস্থা করা, ঋতু পরিবর্তনের সময় প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করা, যৌথ পরিবারের রান্না করা, কাপড়-কাচা, ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা; সেইরকম ঋতু অনুসারে

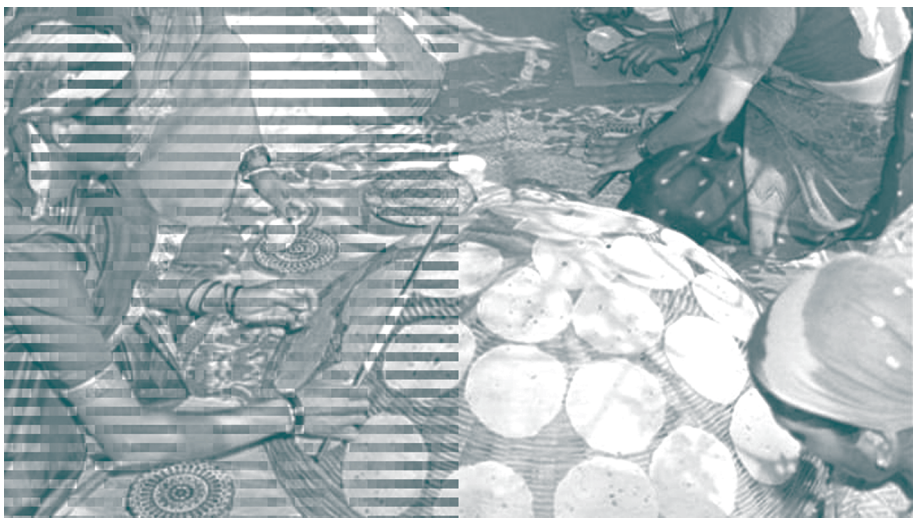

সুবিধামতো চাল-ডাল-মশলা একসঙ্গে বেশি করে কিনে সেগুলি শুকিয়ে, পরিষ্কার করে রাখা, মশলা, ডাল ইত্যাদিতে যাতে পোকা না লাগে, সেজন্য সামান্য তেল লাগানো, রোদে দিয়ে ঠাণ্ডা করে কৌটোয় ঘরে রাখা ইত্যাদি। এছাড়া সময়মতো আচার, বড়ি, পাঁপড় বানানো, সোয়েটার, আসন, বানানো, টুকটাক সেলাই করা, বিভিন্ন উৎসবের জন্য নানারকম খাবার বানানো, অতিথি-সৎকার এইরকম কত কাজেই না ব্যস্ত থাকতেন তাঁরা! ফলে দৈনন্দিন জীবনে তাঁরা সমান্যই বিশ্রাম পেতেন। অনেকে বলেন, এইরকম নিয়মিত পরিশ্রমের ফলে হঠাৎ করে তাঁদের কোনো অসুখ হতো না। তাঁরা দীর্ঘজীবী হতেন।

একথা সত্যি যে, মহিলাদের সংসারের কাজ করাকে সেইভাবে কোনোদিনই মূল্যায়ন করা হয়নি; বেশিরভাগ পরিবার তাঁদের কাজগুলিকে স্বীকৃতি এবং সম্মানটুকুও দেয়নি। কাজগুলি তাঁদের কাছে ছিল বাধ্যতামূলক। শরীর খারপ বা অসুস্থ হলেও যতটা পারতেন পরিশ্রম করতেন। অনেক ক্ষেত্রে সময়মতো চিকিৎসা না হওয়ার জন্য অসময়ে জীবনটাই শেষ হয়ে যেতো। এছাড়া ওই কাজ করা থেকে কোনো আয় হতো না। সেজন্য ওই কাজগুলি উপযুক্ত সম্মান প্রায়শই পায়নি। প্রাপ্য পাওনা হিসেবেই বাড়ির সদস্যরা মনে করতেন। অথচ সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তাঁরা ছোটো-খাটো জিনিসের জন্যও আর্থিকভাবে সম্পূর্ণতই পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। সুতরাং, মহিলাদের আর্থিকভাবে আত্মনির্ভর হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এই ভাবে এল একটি সামাজিক পরিবর্তন। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা এবং আত্মনির্ভরতার প্রচেষ্টা এল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির পারম্পরিক কাজগুলিতে কিন্তু তাঁরা আর আগের মতো সময় দিতে পারলেন না। সংসারের যেসব জিনিস মহিলারা আগে বাড়িতেই তৈরি করে নিতেন, সেগুলি বাজার থেকে কেনা শুরু হলো। তারপর একটা সময় এল, যখন সংসারের কাজ না করাকে আর্থিক সামর্থ্যর অনুপাতে মাপা শুরু হলো। যারা নিজের বাড়ির কাজ নিজে করে— তারা গরিব আখ্যা পেল। বাড়ির সব কাজ মাইনের লোক দিয়ে করানোর প্রচলন হলো। লেখাপড়া শিখে ঘরের কাজ করাকে খুবই হীন মনে করা হয়। এজন্য সমাজে যাদের আর্থিক সচ্ছলতা আছে, তারা রান্নার লোক রাখে, বাজার থেকে প্রচুর জিনিস কেনে। এখন গ্যাস, মাইক্রোওভেন, ইন্‌ডাক্‌শান্‌, কুকার, মিক্সি, ফ্রিজ, কাপড় ধোয়ার যন্ত্র, বাসন ধোয়ার যন্ত্র ইত্যাদি বাজারে সহজলভ্য হয়েছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে শারীরিক শ্রম কম করার কারণে মহিলারা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। যত খাওয়া হয়, তত পরিশ্রম না হওয়ার জন্য ওজন বেড়ে চলেছে। সেই ওজন কম করার জন্য জিমে যেতে হচ্ছে। এজন্য খরচও বাড়ছে। অথচ আগে বাড়িতেই কাজের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ব্যায়ামও হতো।

এই পরিবর্তন খুবই আপেক্ষিক। অতীতে মহিলারা যেসব কাজ করতেন, বর্তমানে বড়ো বড়ো কোম্পানি, পুরুষেরা এবং হোটেল, ধাবা, রেস্টুরেন্টের শেফরা ওই কাজগুলো করে। এমনকী সেলাই করা, কাপড়ে নক্‌শা তোলা, সোয়েটার বানানো, জামা সেলাই, বড়ো বড়ো শেফ, ফ্যাশন ডিজাইনার সবই পুরুষকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। যেসব শিল্পকর্মে মহিলাদের নিপুণতা ছিল সেগুলি শেষ হতে বসেছে। প্রযুক্তি, যন্ত্র এবং পুরুষরা মহিলাদের শারীরিক পরিশ্রম কম করে ফেলেছে। অনেকে এই পরিবর্তনকে নারীমুক্তির জয় বললেও আমরা মহিলারা অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি বা হারাতে বসেছি। বাড়িতে বাড়ির মহিলারা রান্না করবেন, এটা বোধহয় আগামী প্রজন্ম ভাবতেই পারবে না।

সেইরকম রান্নাঘারের টুকিটাকি কাজ, সোয়েটার বানানো জামা সেলাই, আসন বানানো, ইত্যাদির মধ্যে শিল্পীর নিপুণতার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুদীর্ঘ পরম্পরা বিস্মৃত হতে বসেছে। বর্তমানে হয়তো অবস্থা অতটা শোচনীয় হয়নি, তবে অদূর ভবিষ্যতে মহিলাদের একটি সংস্কৃতি-পরম্পরা বিহীন প্রজাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং নারীমুক্তি মানে শুধুই অতীতের সব কিছু ভুলে গিয়ে, ছেড়ে দিয়ে আত্মসুখে নিমজ্জিত হওয়া নয়। আমাদের মহিলাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো— সব কাজের মধ্যেও যা আমরা পেয়েছি, তা সুষ্ঠভাবে পালন করে, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা। ■

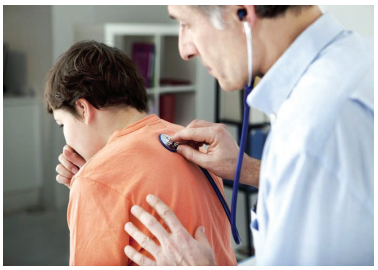

শীতকালের রোগ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

সর্দি-কাশি-জ্বর : সর্দি, কাশি, জ্বর বা কমন কোল্ড শীতের সময়কার একটি সাধারণ রোগ। সর্দিজ্বর দেহের শ্বাসনালির ভাইরাসজনিত এক ধরনের সংক্রমণ। ঋতু পরিবর্তনের সময় এই রোগ বেশি দেখা যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাদের কম তাদের এই রোগ বেশি হয়। হাঁচি, কাশির মাধ্যমে এসব রোগ একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে ছড়ায়। সর্দি, কাশি, জ্বর প্রতিরোধে করণীয় হলো : ১। সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হলে অন্যদের সঙ্গে, বিশেষ করে শিশুদের সঙ্গে মেলামেশায় সতর্কতা অবলম্বন করুন। ২। হাঁচির সময় বা নাকের জল মুছতে রুমাল বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করুন। ৩। রোগীর ব্যবহৃত রুমাল বা গামছা অন্যদের ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। যেখানে সেখানে কফ, থুথু বা শ্লেষ্মা ফেলা যাবে না। ৪। স্বাস্থ্যকর, খোলামেলা, শুষ্ক পরিবেশে বসবাস করতে হবে। ৫। প্রয়োজনমতো গরম কাপড় পরুন। বিশেষ করে তীব্র শীতের সময় কান ঢাকা টুপি এবং গলায় মাফলার ব্যবহার করুন। ৬। তাজা, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং পর্যাপ্ত জল পান করুন, যা দেহকে সতেজ রাখবে এবং রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করবে।

নিউমোনিয়া : এটি একটি মারাত্মক অসুখ। নিউমোনিয়ায় শিশু ও বৃদ্ধরা বেশি ভোগে। পৃথিবীব্যাপী পাঁচ বছরের নীচে শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ নিউমোনিয়া। আমাদের দেশেও শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ এই রোগটি। যদিও এটি প্রতিরোধযোগ্য এবং চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময়যোগ্য একটি রোগ, তথাপি মৃদু বা হালকা নিউমোনিয়া থেকে বাঁচতে কিছু করণীয় হলো : সব সময় শিশুর সঠিক যত্ন নিন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন, বিশেষ করে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করুন। শীত উপযোগী হালকা ও নরম গরম কাপড় ব্যবহার করুন। সহনীয় গরম জলে শিশুকে স্নান করান। বেশি মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। অসুস্থ লোক বিশেষ করে হাঁচি-কাশিতে আক্রান্ত লোকের সামনে শিশুদের যেতে দেবেন না। ব্রংকিওলাইটিস, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুর কাছে কাউকে যেতে দেবেন না। সব সময় নাক পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করুন। ধোঁয়া, মশার কয়েল ও সিগারেটের ধোঁয়া থেকে দূরে থাকুন। সুষম ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়ান, ভিটামিন এ ও ডি গ্রহণ করুন। ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করতে পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন।

অ্যাজমা : হাঁপানি জাতীয় শ্বাসকষ্টের রোগ শুধু শীতকালীন রোগ নয়, তবে শীতে এর প্রকোপ বেড়ে যায়। অ্যাজমা একবার হলে এর মোকাবিলা করতে হয় সারা জীবনই। তবে অ্যাজমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে জটিলতা বা ঝুঁকি থাকে না বললেই চলে। এ জন্য কিছু করণীয় হলো : অ্যাজমার রোগীরা শীতে পর্যাপ্ত গরম জামা-কাপড়ের ব্যবহার করুন। ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করুন। বিশেষ করে শোবার ঘরটি উষ্ণ রাখার চেষ্টা করুন। অ্যাজমার ট্রিগারগুলো জেনে সতর্কভাবে চলুন। শীতের আগেই চিকিৎসককে দেখিয়ে ইনহেলার বা অন্যান্য ওষুধের ডোজ সমন্বয় করে নিন।

চর্মরোগ : শীতকালে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে। শুষ্ক বাতাস ত্বক থেকে শুষে নেয় জল। ফলে ত্বক হয়ে পড়ে দুর্বল। ত্বকের ঘর্মগ্রন্থি ও তৈলগ্রন্থি ঠিকমতো ঘাম বা তৈলাক্ত পদার্থ তৈরি করতে পারে না। এতে ত্বক আস্তে আস্তে আরও শুষ্ক, ফাটল ধরে ও দুর্বল হতে পারে। এক সময় ত্বক ফেটে যায়। শীতের সময় নানা ধরনের চর্মরোগ হতে পারে। বিশেষ করে ঠোঁট, হাত ও পায়ের ত্বকে দেখা দেয় চুলকানি, একজিমা, স্ক্যাবিস প্রভৃতি। এছাড়া মাথায় প্রচুর খুসকি দেখা যায়। এসব থেকে পরিত্রাণ পেতে করণীয় হলো : শীতের সময় অলিভ অয়েল বা লুব্রিকেন্ট জাতীয় কিছু ব্যবহার করুন। খুসকি দূর করতে অন্য সময়ের চেয়ে শীতে বেশি করে চুল শ্যাম্পু করুন। হাত ও পায়ের তালু এবং ঠোঁটে পেট্রোলিয়াম জেলি লাগান। ত্বকের সুরক্ষায় ময়েশ্চারাইজার যেমন— ভ্যাসলিন, গ্লিসারিন, অলিভ অয়েল ও সরিষার তেল ব্যবহার করুন। বেশিক্ষণ রোদে থাকবেন না বা কড়া আগুনে তাপ পোহাবেন না। এতে চামড়ায় সমস্যা তৈরি হতে পারে।

নাক, কান গলার অসুখ : এসব সমস্যাও শীতে বাড়ে। এসব রোগে বেশি ক্ষতি হয় নবজাতক, শিশু, বৃদ্ধ ও ধূমপায়ীর। শীতকালে নাকের দুই পাশের সাইনাসে ইনফেকশন দেখা দেয়, একে বলে সাইনোসাইটিস। কারো সাইনোসাইটিস দেখা দিলে নাকের দুই পাশে ব্যথা ও মাথাব্যথা হতে পারে। অ্যালার্জি, ঠাণ্ডা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো সমস্যাগুলো থেকে এই রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। কারো যদি অ্যালার্জি থাকে, সেক্ষেত্রে জেনে নিতে হবে অ্যালার্জির কারণ। যাতে সতর্ক হয়ে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। পাশাপাশি ধূমায়িত এবং দূষিত পরিবেশ পরিত্যাগ করে চলা, ধূমপান পরিত্যাগ করা, ঘুমানোর সময় মাথা উঁচু রাখা, নাকে খুব জোরে আঘাত লাগতে না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। যাঁদের গলা ব্যথা, স্বরভঙ্গ, কণ্ঠনালির নানা সমস্যাসহ টনসিলের সংক্রমণ বা টনসিলাইটিস রয়েছে, তাঁরা লবণ মেশানো হালকা গরমজল দিয়ে গার্গল করলে আরাম পাবেন। ঠাণ্ডা জল পরিহার করুন, কুসুম গরম ব্যবহার করুন এবং গলায় কাপড় বা মাফলার জড়িয়ে রাখুন। সেই সঙ্গে মাউথ ওয়াশ দিয়ে কুলকুচো করলে ভালো থাকা যায়। জ্বর থাকলে প্যারাসিটামল ও সর্দি-কাশি থাকলে অ্যান্টিহিস্টামিন সেবন করা উচিত।

এছাড়া, আথ্রাইটিস বা বাতের সমস্যা শীতের সময় বেড়ে যায়। মূলত বয়স্কদেরই এই সমস্যা হয় বেশি। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এই সমস্ত রোগের সুচিকিৎসা আছে।

ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কর্তব্য
প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব

বিমলশঙ্কর নন্দ

রাজনীতি বিজ্ঞানে মানুষের অধিকারের আলোচনা আজ বহু যুগ ধরে চলে আসছে। যখনই শাসকের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব মানুষের স্বাধীন জীবনধারার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মানুষ তার অধিকারের দাবিকে জোরের সঙ্গে তুলে ধরে, সেগুলিকে রক্ষার জন্য জীবনকে বাজি রেখে সংগ্রাম করে। মানব ইতিহাসে সাধারণ মানুষের লড়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিচালিত হয়েছে অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে, স্বাধীনতা অর্জনের ইচ্ছায়। সুদূর ইংল্যান্ডে ১২১৫ সালে Magna Carta Libertatum (কথাগুলি মধ্যযুগীয় ল্যাটিন যার অর্থ হলো 'the great charter of Liberties')-এর মাধ্যমে রাজা জন (John) ব্যারনদের বেশ কিছু অধিকারকে স্বীকৃতি দেন। স্বীকৃতি দেন চার্চের কিছু অধিকারকেও। যদিও এই সমঝোতা অচিরেই ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু শাসিতের কিছু অধিকারকে শাসক স্বীকৃতি দেবে এই ভাবনাটাই এরপর ক্রমশ গুরুত্বলাভ করে। শাসক যদি শাসিতের অধিকারকে স্বীকৃতি না দেয় তবে তাকেও তার পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এই ধারণা সত্যি হয়ে গেল ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের বিদ্রোহী প্রজাবর্গ স্টুয়ার্ট রাজবংশের উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল, কারণ প্রজারা মনে করেছিল মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকারের পথে এই রাজবংশ সবচেয়ে বড়ো বাধা। এরপর থেকে রাজনীতি বিজ্ঞান আলোচনার একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে অধিকারের ধারণা।

গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষের অধিকারের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু 'সমাজ'— ধারণাটির সঙ্গে যা যুক্ত হয়ে আছে তা হলো সমষ্টির ধারণা, সমাজ হলো একটি বৃহৎ সমষ্টি বা গোষ্ঠী যা মানুষের যৌথ জীবনকে সম্ভব করে। মানুষের পক্ষে এককভাবে বা বিচ্ছিন্ন ভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। সমাজ হলো বিচ্ছিন্ন মানবীয় সত্তাগুলিকে সম্মিলিত জীবনে নিয়ে আসার একটি ক্ষেত্র। মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন এই সঙ্ঘবদ্ধতা এবং এটা সম্ভব হয়েছে সামাজিক জীবন গড়ে ওঠার মাধ্যমে। কিন্তু সমাজে বাস করতে গেলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে কিছু পরিমাণে সংকুচিত করতেই হয়। এবং সেটা সম্ভব কর্তব্যের মাধ্যমে। কারণ অপরের অধিকার নিশ্চিত করতে গেলে নিজের অধিকার সংকুচিত করতে হয়। সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি, সমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি নিজের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সমাজ জীবনকে সফল করা সম্ভব। শাশ্বত ভারতীয় সামাজিক ঐতিহ্যে এটা মনে করা হয় যে কিছু গ্রহণ করলে কিছু দান করাও উচিত। অধিকারের ধারণা আলোচনা করতে গিয়ে রাজনীতি বিজ্ঞানী লিপসন (Lipson)-ও বলেছেন, "He who gives takes and he who takes, gives." (The Great Issues of Politics)। প্রাচীন গ্রিক নগররাষ্ট্রে কেবল

নাগরিকরাই পরিপূর্ণ রাজনীতির অধিকার ভোগ করেছে কিন্তু রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নগররাষ্ট্রের প্রতি তাদের কর্তব্যও সম্পাদন করতে হতো। কিন্তু ইউরোপে ষোড়শ শতক থেকে পুঁজিবাদের উত্থান এবং পরবর্তী সময়ে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও তা ক্রমেই ইউরোপের সীমা ছাড়িয়ে গোটা পৃথিবীর আধুনিক সমাজে কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা হয়ে ওঠার পর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ক্রমেই মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে। মানুষ আরও বেশি করে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। কিন্তু একবিংশ শতকে এসে আবার নতুন করে রাজনৈতিক ভাবনা এবং মতাদর্শগুলিকে ফিরে দেখা শুরু হয়েছে। কারণ মুক্ত সমাজ, উদারনীতি, মানুষের অধিকার প্রভৃতি ধারণাগুলিকেই আজ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ। এই সন্ত্রাসবাদ এবং মৌলবাদের মূল লক্ষ্য মুক্ত সমাজ এবং উদারবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল কাঠামোটিকে ধ্বংস করা। এককভাবে কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের পক্ষে এর মোকাবিলা প্রায় অসম্ভব। প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে যৌথ প্রচেষ্টার। যে পশ্চিমি উদারবাদী সমাজ এতদিন মানুষের অধিকারের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতো সেখানেও দাবি উঠেছে মানুষ অধিকার ভোগের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্য পালন করুক। অধিকারের পাশাপাশি কর্তব্যের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। গত ২৬ নভেম্বর, ২০১৯-এ ভারতীয় পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ভারতের সংবিধান নাগরিকদের অধিকারের পাশাপাশি কর্তব্যের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছে। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয় গণপরিষদ আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতের সংবিধান গ্রহণ করে। সেই হিসেবে ২০১৯ সালের ২৬ নভেম্বর ছিল ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭০ বছর পূর্তি। সেই উপলক্ষ্যে সংসদের দুটি কক্ষের যৌথ অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'অধিকার এবং কর্তব্য হাতে হাত রেখে চলে। মহাত্মা গান্ধী এই সম্পর্ককে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন... 'আমাদের ভাবতে হবে কীভাবে সংবিধানে উল্লিখিত কর্তব্যগুলো আমরা পালন করবো।' প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতে, 'গান্ধীজী বলেছিলেন আমরা তখনই সমস্ত অধিকারগুলি আশা করবো যখন আমরা সঠিকভাবে কর্তব্যগুলি পালন করবো। অর্থাৎ জাতির জনক মনে করতেন কর্তব্য এবং অধিকারগুলি প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। জাতীয় এবং বিশ্বরাজনীতির সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পশ্চিমি দেশগুলির সংবিধানের মতো ভারতীয় সংবিধানেও শুরুতে মৌলিক কর্তব্যের কোনো উল্লেখ ছিল না। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে চতুর্থ অধ্যায়— ক নামে একটি নতুন অধ্যায় এবং ৫১ (ক) নামে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করা হয়। এই ধারায় ভারতীয় নাগরিকদের দশটি মৌলিক কর্তব্য উল্লেখ করা হয়। ২০০২ সালে ৮৬তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ৫১ (ক) ধারায় আরও একটি মৌলিক কর্তব্য সংযোজিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭৬ সালে স্মরণ সিংহের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় যে কমিটি সবিধানে মৌলিক কর্তব্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে এবং সেই সুপারিশ অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধান মৌলিক কর্তব্যগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যগুলি হলো :

(ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে;

(খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে;

(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহূত হলে সাড়া দিতে হবে;

(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে;

(চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে;

(জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলক মনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে;

(ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে;

(ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে;

(ট) ২০০২ সালের ৮৬তম সংশোধনী আইন অনুসারে নতুন সংযোজিত কর্তব্যটি হলো, 'ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।' এ হলো মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের মৌলিক কর্তব্য।

সাধারণভাবে পশ্চিমের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ নেই। কিন্তু অন্য অনেক দেশের সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ আছে। আসলে সংবিধানে তাদের অন্তর্ভুক্তি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। পশ্চিমের সমাজগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। অন্যদিকে প্রাচ্যের সমাজে যৌথ জীবনের গুরুত্ব অনেক বেশি। ফলে সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্যগুলির মধ্যে কয়েকটির যথেষ্ট নৈতিক মূল্য আছে। যেমন দ্বিতীয় মৌলিক কর্তব্য— সেখানে দেশের জাতীয় আন্দোলনকে যে মহান আদর্শ অনুপ্রাণিত করেছিল তাকে পোষণ ও অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে।

আবার কতগুলি মৌলিক কর্তব্য পৌর (civil) প্রকৃতির। যেমন জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতকে শ্রদ্ধা করা। এ প্রসঙ্গে আর একটি মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ করতে হয়। এটি হলো বনভূমি, হ্রদ, নদী, প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ সম্পর্কিত মৌলিক কর্তব্য। ১৯৭২ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে প্রথম বিশ্ব বসুন্ধরা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে বিশ্বপরিবেশের অবনতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে উদ্যোগী হতে দেশগুলিকে অনুরোধ করা হয়। তারই প্রভাবে ভারতীয় সংবিধানে এই মৌলিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্তি। এই প্রসঙ্গে দুটি আইনেরও উল্লেখ করা যায়। এগুলি হলো ১৯৭২ সালের The Wildlife (protection) Act এবং ১৯৮০ সালের The Forest (Conservation) Act। প্রথম আইনে দুষ্প্রাপ্য এবং অবলুপ্ত প্রায় প্রাণীসমূহের ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আইনে বনাঞ্চলের বেহিসেবি ধ্বংসসাধন এবং বনভূমিকে অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের উদ্যোগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ পরিবেশ সংরক্ষণের যে ভাবনা ভারতীয় সমাজে বহুদিন ধরে আছে মৌলিক কর্তব্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্টও তাঁদের একাধিক রায়ে (৫১-ক) ধারার প্রায়োগিক ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করেছেন। অশোক কুমার ঠাকুর বনাম ভারত সরকার মামলায় (২০০৮) বিচারপতি ভাণ্ডারি অভিমত দেন যে ৫১ (ক) ধারা রাষ্ট্রের উপর কোনো মৌলিক কর্তব্য ন্যস্ত করেনি একথা ঠিক। কিন্তু সকল নাগরিকের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে রাষ্ট্র। তাই ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হলো রাষ্ট্রের সমষ্টিগত কর্তব্য। আবার জর্জ ফিলিপ বনাম ভারত সরকার মামলায় (২০০৬) সুপ্রিম কোর্ট এই অভিমত প্রকাশ করে যে আদালতের উচিত নয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়-ক অংশের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও মূল নীতির পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

একথা ঠিক যে চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতিগুলির মতো চতুর্থ অধ্যায়-ক অংশের মৌলিক কর্তব্যগুলিও আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। আদালত সরাসরি

অধিকার যদি কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয় তবে সুস্থ সমাজ গঠনের পথে তা এক বড়ো অন্তরায় হবে। সম্প্রতি ভারতে একটি কেন্দ্রীয় আইনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কিছু মানুষ যেভাবে সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করেছে তাতে সমাজস্থ মানুষকে তার মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা আবার নতুন করে অনুভূত হচ্ছে।

কর্তব্যগুলিকে কার্যকর করতে পারে না। কর্তব্যগুলি অমান্য করলে কোনো শাস্তির ব্যবস্থাও নেই। তবে ভারতের সংসদ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে মৌলিক কর্তব্যগুলি বলবৎ করার ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু এর নৈতিক গুরুত্ব এবং প্রভাবটিকে অস্বীকার করা যায় না। সংবিধানে সন্নিবিষ্ট মৌলিক কর্তব্য নিয়ে আলোচনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জনমানসে এগুলি সম্পর্কে ভাবনাও বাড়ছে। মৌলিক কর্তব্যগুলি ভারতীয় সংবিধানে কেবল শোভাবর্ধনকারী অংশ হিসেবে যাতে না থাকে সে বিষয়ে সরকারও বিভিন্ন সময়ে ভাবনা চিন্তা করেছে। ১৯৯৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার মৌলিক কর্তব্যগুলিকে কীভাবে কার্যকরী করা যেতে পারে সেই বিষয়টি বিবেচনার জন্য বিচারপতি জে. এম. ভার্মার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। ভার্মা কমিটি ১৯৯৯ সালে তার সুপারিশ পেশ করে। কমিটি মনে করে যে নির্বাচনে ভোট দেওয়া, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা এবং কর প্রদান করাকে ৫১ (ক) ধারায় মৌলিক কর্তব্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৭৬ সালে স্মরণ সিংহ কমিটিও কর প্রদান সম্পর্কিত বিষয়টিকে মৌলিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছিল, যদিও ৪২তম সংশোধনীতে এই কর্তব্যটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ১৯৯৯ সালে ভার্মা কমিটি কতগুলি আইনকে চিহ্নিত করে যেগুলি মৌলিক কর্তব্যসমূহকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। যেমন ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫৬ সালের The protection of Civil Rights Act, ১৯৬৭ সালের বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১ সালের জাতীয় সম্মানের প্রতি অসম্মান প্রতিরোধ আইন (The Prevention of Insults to National Honour Act), ১৯৭২ সালের The Wild life (Protection) Act, ১৯৮০ সালের The Forest Conservation Act প্রভৃতি। নাগরিকরা যাতে তাদের মৌলিক কর্তব্যসমূহ পালন করে তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপ্রিম কোর্ট ২০০৩ সালে ১১ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এক নির্দেশ জারি করে। এই নির্দেশে ভার্মা কমিটির সুপারিশগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা এবং সেগুলিকে কার্যকর করার কথা বলা হয়। সুপ্রিম কোর্ট এ-ও মনে করেন যে, এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন।

রাজনীতি বিজ্ঞান আলোচনার মূল জায়গায় আবার ফিরে যাওয়া দরকার। অধিকার যদি কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয় তবে সুস্থ সমাজ গঠনের পথে তা এক বড়ো অন্তরায় হবে। সম্প্রতি ভারতে একটি কেন্দ্রীয় আইনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কিছু মানুষ যেভাবে সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করেছে তাতে সমাজস্থ মানুষকে তার মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা আবার নতুন করে অনুভূত হচ্ছে। গোটা বিশ্বজুড়ে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মিলে গিয়ে এক বিপজ্জনক শক্তি তৈরি হয়েছে যা উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং মুক্ত সমাজের সামনে এক ভয়ংকর বিপদ নিয়ে আসছে। এই প্রেক্ষাপটে মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে এক সার্বিক সচেতনতা জরুরি। এই সচেতনতাই মানবজাতিকে তার আশু বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবে। ■

আমাদের সংবিধান ও নাগরিক কর্তব্য

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে, আমাদের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ১০ থেকে ৩৬ নং অনুচ্ছেদে সাত ধরনের নাগরিক অধিকারের উল্লেখ থাকলেও নাগরিক কর্তব্য নিয়ে কোনও কথা ছিল না। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে নির্দেশমূলক নীতি বা Directive Principles-এর শেষে ৫১-ক অনুচ্ছেদ যুক্ত করে কতকগুলো নাগরিক কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

তাৎপর্যের বিষয় হলো— আমাদের সংবিধান মূলত ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থাকে অনুসরণ করলেও এক্ষেত্রে বিরাট ব্যতিক্রম ঘটেছে। ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। প্রচলিত প্রথাই সেখানে প্রায় সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আমাদের সংবিধান লিখিত এবং পৃথিবীতে বৃহত্তম। এখানে অনেক কিছুর মতো নাগরিক অধিকারও লিখিত।

অবশ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটা তাৎপর্যপূর্ণ কথা আছে— 'Rights and duties are co-relative'— অর্থাৎ অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং অধিকার থাকলে কর্তব্যও থেকে যায়।

কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে, আমাদের সংবিধানে নাগরিক অধিকারগুলো লিখিত ও বলবৎযোগ্য (enforcable) থাকলেও ১৯৭৬ সালের আগে কর্তব্যগুলো নির্দিষ্ট ছিল না। অধিকার ছিল সাতটা— (১) সাম্যের অধিকার; (২) স্বাধীনতার অধিকার; (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার; (৪) ধর্মীয় অধিকার; (৫) শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক অধিকার; (৬) সম্পত্তির অধিকার ও (৭) সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার। তবে ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের দ্বারা সম্পত্তির অধিকারকে বাদ দেওয়া হয়েছে— বর্তমানে অধিকার ছয় ধরনের।

তবে, আগেই বলেছি— নাগরিকের কর্তব্য বিষয়ে সংবিধানে কোনও কথা ছিল না। অবশ্যই এটা অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার ছিল— কারণ নাগরিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার আদায় করবেন কর্তব্য পালন না করেই— এটা হতে পারে না। ড. এ.সি. কাপুর মন্তব্য করেছেন, 'Incorporation of a charter of Fundamental Duties in the constitution is one of the important features of the constitution. — (দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ. ১৫৭)। ড. এম. ভি. পাইলির মতে, এগুলো হলো 'a code of conduct' —প্রাপ্ত অধিকারের বিনিময়ে নাগরিকদের এগুলো পালন করতে হবে— (অ্যান্ ইনট্রোডাকশন টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান' অব ইন্ডিয়া, পৃ. ১৫৩)।

এই কর্তব্যগুলো হলো—

(১) সংবিধানকে মান্য করা ও আমাদের পুরনো ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা,

(২) যেসব মহান আদর্শ আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে পরিচালিত করেছে, তাদের মান্য করা;

(৩) দেশের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা;

(৪) দেশের সুরক্ষায় সাহায্য করা ও প্রয়োজনে জাতীয় স্বার্থে সাড়া দেওয়া;

(৫) ঐক্যবোধ ও জাতীয়তাবোধে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা ও সকলের মধ্যে ধর্মীয়, ভাষাগত, আঞ্চলিক পার্থক্যের মধ্যেও ঐক্য সঞ্চার করা;

(৬) ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করা;

(৭) প্রাকৃতিক সম্পদ— বিশেষ করে, বনভূমি, হ্রদ, নদী ও জীবন্ত প্রাণীদের সুরক্ষা দেওয়া;

(৮) বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, নাগরিক মূল্যবোধকে সমৃদ্ধ করা এবং জ্ঞান ও প্রগতির পথে প্রবৃত্ত হওয়া;

(৯) জাতীয় সম্পদকে রক্ষা করা ও হিংসাকে দমন করা; এবং

(১০) ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করা।

অবশ্যই এই ধরনের কর্তব্যের কথা সংবিধানে থাকা দরকার। রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি সব মানুষেরই কিছু অবশ্য কর্তব্য আছে। এগুলো রয়েছে 'with a view to inculcate a sense of responsibility in the people'--- (জি. এস. পাণ্ডে--- কনস্টিটিউশনাল ল' অব ইন্ডিয়া, পৃ. ১৯৫)। তাঁর মতে, ইতিপূর্বে আমাদের দেশে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস, জাতীয় পতাকা পোড়ানো, কিংবা প্রচার, দাঙ্গা, কুৎসা প্রচার, অন্তর্ঘাত ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে অবাধে। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, কর্তব্যের উল্লেখ আমাদের ক্ষেত্রে নতুন কিছু নয়— 'These duties are not peculiar to Indian Constitution. Constitutions of U.S.S.R. Chaina, Czechoslavia, Hungary. Japan, Koria, Labanon, Poland, Rumania, Thailand, Mongolia and many other countries provide for duties of their citizen.'

১৯৭৬ সালের ২৭ মার্চ তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এইচ. আর. গোখেল মন্তব্য করেছিলেন, এই ধরনের ব্যবস্থা সৃষ্টি করবে 'Sobering effect of those restless spirits who have led host of anti-nationalist, subversive and unconstitutional agitation in the poat'.— (টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, ২৭.৩.৭৬)। স্মরণ সিংহ কমিটিও এই ধরনের কিছু করার পরামর্শ দিয়েছিল।

আসলে, আমাদের দেশের অসংখ্য মানুষ স্বার্থপর, অসহিষ্ণু, ধর্মান্ধ ও রাজনীতি-নিমজ্জিত ও আদর্শহীন। তাঁরা শুধু নিজেরটা বোঝেন এবং আবেগে বলেন। সেই জন্যই তাঁদের সুপথে টানার জন্য কিছু নৈতিক শিক্ষাদানের দরকার ছিল।

অবশ্য প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল পি.কে. দপ্তরী মনে করেন— আমাদের দেশের মানুষ আইন-অনুসারী ও শান্তিপূর্ণ আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু আগেই বলেছি— অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সেই জন্যই ড. বিদ্যাধর মহাজন জানিয়েছেন, কর্তব্যবোধটা নাগরিক-চেতনা জাগরিত করবে, গড়ে তুলবে

উন্নত চেতনার পরিবেশ— (দ্য কন্‌স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ১৫৭)। গড়ে উঠবে সমৃদ্ধ দেশ।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাও মনে আসে।

প্রথমত, ৫১-ক ধারাকে রাখা হয়েছে 'নির্দেশমূলক নীতি' অধ্যায়। সংবিধানের ৩৭নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সমগ্র অধ্যায়টাই বলবৎ-অযোগ্য— অর্থাৎ এগুলো কেউ অমান্য করলে তাঁকে আইনত কোনও শাস্তি দেওয়া যায় না। ড. হরিহর দাসের ভাষায়— 'As there is no legal force behind them, the Directive Principles are dulled as mere pious ambitions'— (ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ১৩৭)। প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন— 'The legal utility of the Fundamental Duties is similar to that of the Directive Principles'— তাদের পেছনে 'legal sanction' নেই--- (কন্‌স্টিটিউশনাল ল' অব ইন্ডিয়া, পৃ. ১২৯)। অনুরূপভাবে ড. এস. সি. কাশ্যপ মন্তব্য করেছেন, 'the duties of citizns also cannot be enforced by courts. There is no provision for ensuring their compliance on for punishing their violation'— (আওয়ার কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ১৪০)।

দ্বিতীয়ত, অনেকে মনে করেন, সংবিধান কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক কর্তব্যের কথা উল্লেখ করলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ গিয়েছে। যেমন ফ্যামিলি প্ল্যানিং, সন্তানকে শিক্ষাদান, কর দেওয়া ইত্যাদি বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। বলা উচিত, ৫১-ক ধারাটা পর্যাপ্ত নয়।

তৃতীয়ত, নাগরিক কর্তব্যগুলো লিখে দিলেই হয় না। সেগুলো পালন করার জন্য দরকার সচেতনতা সৃষ্টি, আর তার পেছনে থাকা উচিত উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার তেমন হয়নি। কোনো কোনো গোষ্ঠী অর্থাভাব ও অশিক্ষার কারণে অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত। সেক্ষেত্রে কর্তব্যগুলোর অধিকাংশই লিখিত আকারে থেকে যাবে— আর অধিকাংশ মানুষ সংবিধানের মলাটই দেখেননি।

চতুর্থত, এক নাগরিকত্ব, ঐক্যবোধ, জাতীয় সংহতি ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, আঞ্চলিকতা, ঐতিহ্য নিয়ে বহুধাবিভক্ত। এই সব নিয়ে মাঝে মাঝে হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটে।

এই কারণে ড. এস. এল. সিক্রি মনে করেন, সমস্যাটা অত্যন্ত জটিল। এগুলোকে দূর করা এক দুরূহ ব্যাপার--- (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২৫৯)।

পঞ্চমত, আরও রয়েছে বহু দলীয় সমস্যা। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছেন— ২০০৫টা দল তাদের নাম নথিভুক্ত করেছে। যে দেশে এতগুলো রাজনৈতিক পক্ষ থাকে, সেখানে উচ্চাঙ্গের নাগরিকত্ববোধ আশাই করা যায় না। দায়িত্ববোধহীন ও সস্তা নেতৃত্ব রাজনৈতিক কারণেই জটিলতা, বিভেদ, বৈরিতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ জিইয়ে রাখে। প্রতিবাদের নামে রক্তপাত ও হানাহানির ফলে জাতীয় সম্পত্তি রক্ষার বদলে সেগুলো ধ্বংস করা হয়। রেল-কাউন্টারের টাকা লুঠ হয়। অনেক সময় পেছনে থাকে কোনো কোনো দল ও রাজ্য সরকারের নির্লিপ্ততা এমনকী প্রশ্রয়ও। সংবিধান তাদের গণ্ডিবদ্ধ করতে পারেনি।

সব শেষে বলা যায়, কর্তব্যগুলো নানা ধরনের এবং অস্পষ্টও— ড. জে. সি. জোহারীর ভাষায় : 'it is not as it ought to have been exhaustive।'

তাছাড়া কর্তব্যগুলো 'either vague or they are beyond the comprehension of an average man'— (ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, পৃ. ১৫১)। তাঁর প্রশ্ন— 'rich heritage of our composite culture', 'scientific temper', 'spirit of inquiry and reform' এই কথাগুলোর অর্থ সাধারণ মানুষ বুঝবেন? সেইসব আদর্শ যা আমাদের মুক্তি-সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছে, সেগুলি কী, সেটা কয়জন জানেন? উচিত ছিল— প্রাথমিক কর্তব্যগুলোর উল্লেখ।

তবু বলি— এই সংযোজনের একটা মূল্য আছে। নাগরিকের কিছু কর্তব্য থাকে— যদি সেগুলো অন্তত কিছু মানুষও জানেন এবং পালন করার জন্য সচেষ্ট হন, তাহলে দেশ প্রগতির পথে অনেক এগিয়ে যেতে পারে। সেই কারণেই এগুলোর একটা শিক্ষাগত মূল্য (educative value) আছে। তবে ভালো হতো এগুলোকে আদালত গ্রাহ্য করা হলে, কর্তব্যে অবহেলার ব্যাপারটাকে শাস্তিযোগ্য করে তুললে।

অবশ্য নেতা-নেত্রীরা 'দিতে হবে, দিতে হবে' শিখিয়েছেন। মানুষেরও কিছু যে দেওয়ার আছে— সেটা তাঁরা জানেন না। ■

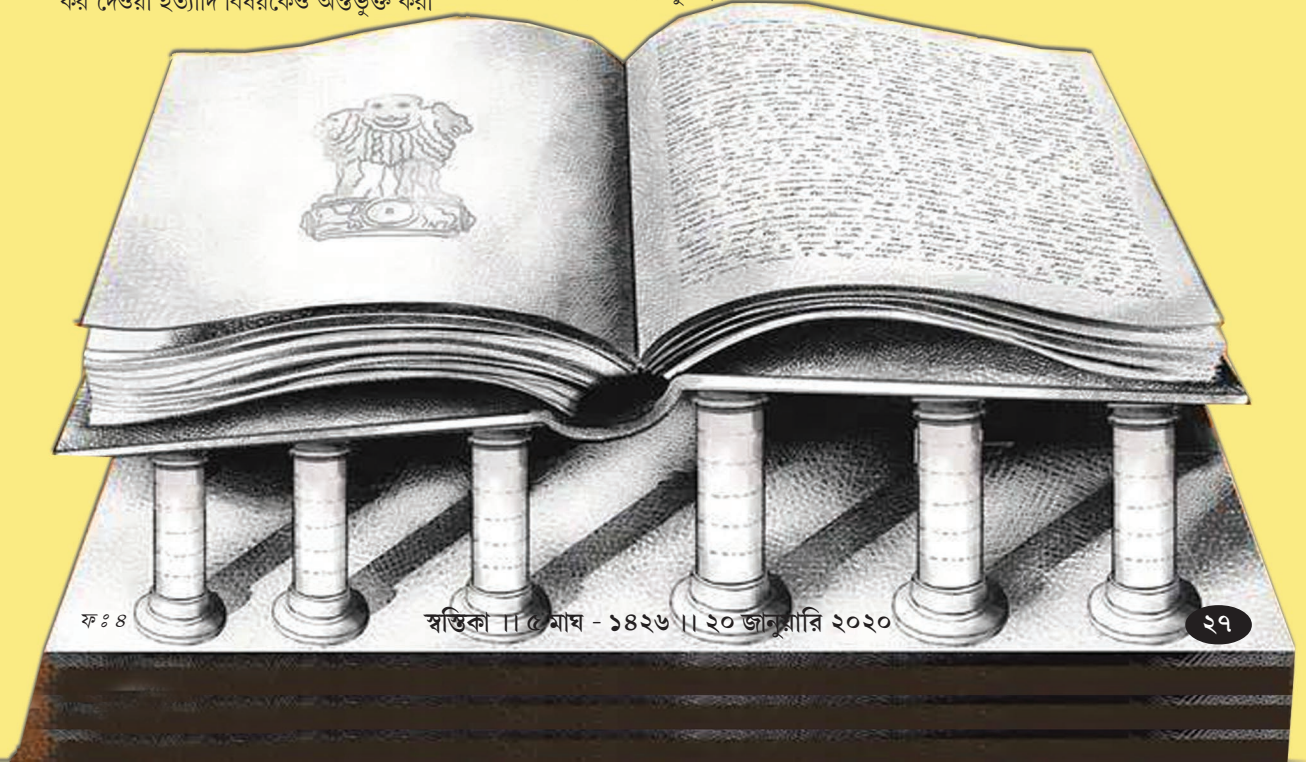

হাওড়া মহানগরের পূর্বতন সঙ্ঘচালক ডাঃ সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

'আমার বাবা ছিলেন বটবৃক্ষের মতো। কত যে অসহায়, দরিদ্র, আর্ত মানুষ তাঁর ছায়া পেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।' গত ৫ জানুয়ারি কেশবচন্দ্র স্মৃতি রক্ষা সমিতির উদ্যোগে হাওড়া শহরের শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া মহানগরের পূর্বতন সঙ্ঘচালক ডাঃ সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে আয়োজিত নাগরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার মূল সুরটি এভাবেই বেঁধে দিয়েছিলেন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা ডাঃ শ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলছিলেন, 'বাবা ব্যক্তিজীবন ও সমাজের মধ্যে কোনো ভেদরেখা টানার চেষ্টা করেননি কখনও। পরিবারে আমাদের অভাব যেমন রাখেননি, তেমনি আমাদের সঙ্গীসাথিদের মুখও ম্লান হতে দিতে চাননি। পুজোয় আমরা জামাকাপড় পেলে তার সঙ্গে আরও অনেকেই পেত। পাঠ্যপুস্তক দিয়ে সাহায্য করতেন কত গরিব ছাত্র-ছাত্রীকে। একদিন কলেজে যাব, বাবাও দেখলাম রোগী দেখতে যাবেন বলে স্কুটার বের করছেন, বললেন, ও পথেই যাচ্ছি, একজন রোগীকে দেখে তোকে কলেজে পৌঁছে দেব। রোগী দেখে বেরিয়ে আসছেন, দেখি পেছন পেছন এক ভদ্রলোক, দেখলেই মনে হয় আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, এসে বাবার হাতে একমুঠো কয়েন তুলে দিয়ে বললেন, এই আমার সম্বল, কিছু মনে করবেন না। বাবা তার থেকে এক টাকা তুলে নিলেন আর নিজের পকেট থেকে দুশো টাকার নোট বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, রোগীর যে পথ্য লাগবে এদিয়ে কিনে নেবেন। চেম্বারে গিয়ে কম্পাউন্ডারবাবুকে আমার নাম করে বলবেন, প্রেসক্রিশনের ওষুধগুলো দিয়ে দিতে, পয়সা লাগবে না।' মেয়ের কথা বলে নয়, 'সুধীর ডাক্তার' যে সে রকমই, শিবপুরের লোকজন সবাই জানেন। এলাকার রোগগ্রস্ত মানুষ নিত্যই তাঁর অঘোষিত দাতব্য চিকিৎসার সুযোগ পেতেন। তাঁর আদিবাড়ি ও চেম্বারের কাছেই ছিল মুসলমান পাড়া, তাঁরাও বঞ্চিত হতেন না।

শতবর্ষ প্রাচীন শিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাণ্ডারে থাকে অনাথ ছাত্ররা। ১৯৬৩ সাল থেকে তিনি তার মেডিক্যাল অফিসার। ভাণ্ডারের সম্পাদক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পদটা অবৈতনিক, উলটে নির্দিষ্ট পরিমাণ দান তিনি ভাণ্ডারকে দিতেন। মরসুমে ফি বছর আবাসিকদের আম খাওয়াতেন। তাঁর স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত হতো না ওলাবিবিতলার শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বা মধ্য হাওড়ার দীননাথ শিশুসদনের মতো প্রতিষ্ঠানও। শিবপুরের মেডিসিন ব্যাঙ্কের সঙ্গে সূচনাকাল থেকেই তিনি যুক্ত ছিলেন, তাঁর বাড়তি 'ফিজিসিয়ান্স স্যাম্পল' পৌঁছে যেত সেখানে।

হাওড়া পুসভার মেয়র পারিষদ তথা প্রধান শিক্ষক শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, একেই তো বলে মনুষ্যত্ববোধ। আর এজন্যই সুধীরদা ছিলেন সর্বজনপ্রিয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়। নিজের আদর্শে ছিলেন দৃঢ়, তাই বলে ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি ছিল না কোনো বিরূপতা। বিদ্যা ভারতী তথা বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের প্রবীণ কার্যকর্তা বিজয় গণেশ কুলকার্নি ১৯৭১ সাল হাওড়ায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে কাজ করতে এসে সুধীরদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের উল্লেখ করে বলেন, সার্থকনামা তিনি, ছিলেন অত্যন্ত ধীরস্থির প্রকৃতির, সদাহাস্যময় এবং সঙ্ঘকাজে সমর্পিত প্রাণ। শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ তিনি একটি স্বরচিত কবিতাও পাঠ করে শোনান—
'সৌম্যমূর্তি সুধীরো যঃ লোকপরায়ণঃ/
সঙ্ঘনিষ্ঠঃ কর্মবীরঃ সুহৃদঃ ব্যাধিপীড়িতানাম্
/ সঙ্গীতজ্ঞঃ মধুকণ্ঠঃ মৃদুবাচঃ প্রসন্নানঃ/

বন্দ্যোপাধ্যায় কুলে জাতঃ তং সুধীরং প্রণম্যাহম্।' রামকৃষ্ণ শিশুমন্দিরের প্রধানাচার্য ঋতা চক্রবর্তী বলেন, স্বয়ংসেবকদের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় ভালোবাসা। জরুরি অবস্থার সময় সত্যাগ্রহ করে বন্দি স্বয়ংসেবকদের সব সময় খোঁজ রাখতেন উদ্বিগ্ন সুধীরদা। হাওড়া মহানগর সঙ্ঘচালক সঞ্জয় কুমার বসু বলেন, সুধীরদার সান্নিধ্য খুব অল্প সময়ের জন্য পেয়েছি, কিন্তু উনিই আমার প্রেরণা ও পাথেয়। শিবপুর অরবিন্দ সাধক সঙ্ঘের গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় সুধীরদার সাহিত্যিক সত্তা ও সাংগীতিক প্রতিভার কথা তুলে ধরেন। গেয়ে শোনান তাঁর একটি গানও।

শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ছাড়াও হাওড়ার বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কয়েকশো মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশেরই প্রেরণাপুরুষ ছিলেন সুধীরদা। শুরুতেই সভার সঞ্চালক বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা হাওড়া মহানগরের পূর্বতন সহ মহানগর সঙ্ঘচালক রথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুধীরদার জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, কৈশোরে সঙ্ঘ শাখায় নিত্য 'নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে' ও 'ভারতমাতা কী জয়' উচ্চারণের মধ্য দিয়েই তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়ে গিয়েছিল। সংবেদনশীল চিকিৎসক শুধু নয়, তিনি দক্ষ সংগঠক, দরদি সমাজসেবী ছিলেন। শিবপুরে এমন সংগঠন খুব কম যার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না। হাওড়ার মহেশ ভট্টাচার্য হোমিয়োপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনাও করেছেন। একটি বিশেষ আদর্শবাদে বিশ্বাসী হলেও সুবিস্তৃত সামাজিক পরিমণ্ডলে তা কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। সংগীতজ্ঞ হিসেবেও ছিলেন সুখ্যাত। পড়াশোনা করতেন প্রচুর, বক্তৃতা ও লেখায় পড়ত তার প্রতিফলন। সভায় গীতা পাঠ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সংগীত পরিবেশন করেন দেবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, আবৃত্তি করেন গৌরী চৌধুরী, সরোদ বাজান সুধীরদার ভ্রাতুষ্পুত্র শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা সমিতির সভাপতি সুশীল দলুই। শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ ও সুধীরদার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি হয়। ■

আলিপুরদুয়ার জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিকালীন অভীক্ষা

গত ৫ জানুয়ারি বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ, আলিপুরদুয়ার জেলার উদ্যোগে ২০২০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিকালীন অভীক্ষা (MCQ Mock Test)-র আয়োজন করা হয়। জেলার প্রত্যেক ব্লক বা খণ্ডস্তরের সাতটি বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১১৮৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। পরিচালনায় ছিলেন ১৭৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। সব জায়গায় শিক্ষাকর্মীরাও সহযোগিতা

করেন। পরীক্ষা গ্রহণের ১ ঘণ্টা পর উত্তরপত্র মূল্যায়নের শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। তার মধ্যেই প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক বিদ্যুৎ মজুমদার, আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি দেবাদিত্য মণ্ডল, জেলা সম্পাদক প্রকাশ ভৌমিক-সহ অন্যান্য কার্যকর্তা। জেলাজুড়ে এই অভিনব উদ্যোগ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

কর্মযোগীর উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ৭ জানুয়ারি কর্মযোগীর উদ্যোগে আসানসোল জেলার বারাবনির কাছে শিলাধাওড়া গ্রামে বনবাসী সমাজের মানুষদের নারায়ণ রূপে পুজো করে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। একই দিনে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের কাছে বাঁকাদহে ৫৩ জন দুঃস্থ মানুষকে সোয়েটার দেওয়া হয়।

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

গত ৬ জানুয়ারি হাওড়া জেলা ক্রীড়া ভারতীর ধুলাগড়ী শাখার উদ্যোগে এবং বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সহযোগিতায় ধুলাগড়ী পশ্চিমপাড়া বাদামতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার বিশিষ্ট কার্ডিয়োলজিস্ট, অর্থোপেডিক, হোমিয়োপ্যাথিক এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতমাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শিবিরের শুভারম্ভ হয়। বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া ভারতীর হাওড়া জেলা সম্পাদক শুভেন্দু সরকার। বাস্তুহারা সহাযতা সমিতির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সাধারণ সম্পাদক তপন গাঙ্গুলি। শিবিরে ২০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং ১০০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে তাদের চশমা দেওয়া হয়।

শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা নিবেদন

বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরের বিশিষ্ট সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধা গত ১৫ ডিসেম্বর ১২২ তম অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সিউড়ীর কলেজ পাড়ার বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব ৮০ বছর বয়স্ক ড. রণজিৎ বাগকে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মণ্ডল। শ্রীবাগকে মাল্য দানে ভূষিত করেন সন্তোষ রায়। তাঁকে আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। পূজা করেন সুজাতা সাহা। উত্তরীয়, ফল মিষ্টি ও মানপত্র দিয়ে ভূষিত করেন ড. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সংগীত পরিবেশন করেন বেশ কয়েকজন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শতাধিক মানুষ। পরিচালনায় ছিলেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

পশ্চিমবঙ্গে ধাতু শিল্পের লৌকিক রূপ

চূড়ামণি হাটি

উৎপাদনের গতি বৃদ্ধিতে মানুষের নজর দেওয়া শুরু সংগ্রাহক থেকে উৎপাদক হবার পর। সমাজ সভ্যতা গঠনের প্রয়োজনে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে কাজের গতিকে তরান্বিত করতে কর্মের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ তৈরি হয়েছে। দু'-একটি পরিবারের বংশধারা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়েছে ছোটো ছোটো পাড়া। অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতিতে নানা প্রতিযোগিতার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে গৃহের ভেতরের কাজের পরিবেশ ক্রমশ বাজারমুখী হয়েছে। ফলে কাজের পরিবেশকে ঘিরে ভিড় জমানো বংশপরম্পরাগত চর্চার ধারাকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে ওঠা পাড়াগুলির চেহারার বদল ঘটেছে। ঠিক যেমন বদল ঘটেছে পরিবারগুলির বর্তমান প্রজন্মের মানসিকতার। বংশগত কর্মজীবনের এ-ধারা ও-ধারা অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। শিকারীজীবন ও কৃষিজীবনকে সচল রাখতে লৌহকর্মে দক্ষ কর্মকার ও তাম্রশিল্পের কাঁসারি সম্প্রদায়ের সাহায্য ছিল অবশ্যম্ভাবী। স্বর্ণকাররা মূলত মনের খিদে মেটাতো। মালাহার সম্প্রদায়ের ঢোকরা কামারদের ভূমিকাও ছিল মূলত একই। কিন্তু সস্তায় মন টেনেছে। মাপ কোটোয় পিতলের পাত বসে আবার দামি হয়।

কোনো ভাবে মরচে লাল হিমাটাইট ও মরকত-সবুজ ম্যালকাইট আগুনের সংস্পর্শে এসে ধাতু রূপে প্রকাশিত হয়। হিমাটাইটে লুকিয়ে থাকে লোহা, আর ম্যাকাইটে তামা। এক সময় কৃষ্ণায়স অর্থে লোহাকে স্বর্গীয় ধাতু হিসেবেই মানা হতো। কারণ সিডোরাইট লোহার উৎস উল্কাপাতের মধ্য দিয়ে। তামার নিয়মিত প্রচলন প্রায় ৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু কাঁসা-পিতলের প্রচলন আরও তিন হাজার বছর পরে। সাত ভাগ তামার সঙ্গে দু' ভাগ রাং মিশিয়ে তৈরি হয় কাঁসা। মূলত মালয়েশিয়া থেকে রাং আসে টিন-ইনগট হিসেবে।

প্রয়োজনে তামাও আমদানি হয়। সতেরো ভাগ তামার সঙ্গে পনেরো ভাগ দস্তা মিশিয়ে তৈরি হয় পিতল। শিট পেতলের ক্ষেত্রে আঠারো ভাগ তামার সঙ্গে চার ভাগ দস্তা। ভরণ বা ঢালাই পেতলের ক্ষেত্রে সাত ভাগ তামার সঙ্গে পাঁচ ভাগ দস্তা। প্রাচীন শাস্ত্রে ধাতু গলিয়ে ছাঁচে ফেলে বিগ্রহ নির্মাণের উল্লেখ আছে। প্রথম দিকে পাথরের গা ছাঁচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাটির ছাঁচ গড়া মূলত মেয়েদের কাজ। কিন্তু তামার দ্রব্য ঢালাই করে প্রস্তুত হয় না। পিণ্ডকে পিটিয়ে পিটিয়ে আকার দেওয়া হয়। লোহা কঠিন ধাতু, তাই লোহাকে পুড়িয়ে লাল করে পিটিয়ে পিটিয়ে কাঙ্ক্ষিত রূপ দিতে হয়। লোহার ইস্পাত রূপ কাঁসার থেকেও উৎকৃষ্ট। কার্বনের পরিমাণ অনুসারে লোহা কাস্ট বা পিগ আয়রন, পেটা বা রট আয়রন ও স্টিল তিন ভাগে বিভক্ত। কাস্ট আয়রন থেকে কার্বনের পরিমাণ কমিয়ে হয় ইস্পাত। বলাবাহুল্য তাম্রযুগের পরেই এসেছে লৌহযুগ। ভারতে এ যুগের সূচনা সিন্ধু সভ্যতার পরে। ছিল ব্রোঞ্জের ব্যবহার। তামা, নিকেল, দস্তার মিশ্র রূপ।

বীরভূমের মহিষাদল, বর্ধমানের পাণ্ডুরাজার ঢিবি, উত্তর-পশ্চিম মেদিনীপুরের পাহাড়, জঙ্গলে তাম্রচুল্লি ও ধাতুমলের সন্ধান মিলেছে। লোহার সন্ধান মিলেছে বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার ভুলুকসোধা গুহায়, বীরভূমের বক্রেশ্বর নদী তিরে হাটিগ্রায় এবং বর্ধমানের মঙ্গলকোটে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে, মেদিনীপুরের লালজল গুহায়। ছোটোনাগপুরের মালভূমিটি তামা এবং বীরভূম জেলাটি লোহার মূল উৎসভূমি। জাহাজের নীচে পাত লাগানোর কাজটি হতো হাওড়ার শালিখায়। পুরনো জাহাজ ভাঙা হলে যে ধাতু বেরোয়; তামার পাত তার অন্যতম। তামাও শিল্পরূপ পেতে শিল্পীদের কাছে পৌঁছেছে। যা ছিল মাটির ও কাঠের; তা হয়েছে তামা, কাঁসা, পেতলের। এমনকী ছাঁচে ঢালা মুদ্রা ও স্মারক এবং দেবদেবীর মূর্তিও তৈরি হয়েছে। আয়তন ও গড়ন অনুসারে বাসন-কোসনের নানা নাম। স্থান বিশেষে বেশ কিছু বাসন গুরুত্ব পেয়েছে।

বর্ধমানের দাঁইহাটের মেটারিয়ার বাটি, কাঞ্চননগরের থালা; মুর্শিদাবাদের খাগড়ার

গ্লাস, মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার পান রাখার ডাবর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের ঘড়া-কলসি, পাত্রসায়েরের হামান দিস্তা; হুগলির বালি, দেওয়ানগঞ্জ ও বাঁশবেড়িয়ার গাড়ু, নদীয়ার নবদ্বীপের ঘটি, শান্তিপুরের সর্বসুন্দরী ঘড়া, কলকাতার কালীঘাটে পানদানি, কাঁসারি পাড়ার জালা, নতুনবাজারের জগ, কাশীপুরে তালা, সিমলার কোশা-কুশি; উত্তর চব্বিশ পরগনার টাকি, বসিরহাটের হুঁকো। এছাড়া আছে নদিয়ার তিলিপাড়া ও রামগরের মাদুলি, শান্তিপুরে তামার আংটি। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের ঠাকুরের সিংহাসন, নদিয়ার মেটিয়ারির পুষ্পপাত্র ও কলকাতার কাঁসারি পাড়ার সাজি এবং সঙ্গে দেবতার রূপ পিতল ঢালাই করে কিংবা পিতল মিশ্রিত অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি হয়েছে নবদ্বীপ, কালীঘাট, নতুনবাজার, উল্টোডাঙ্গা-সহ নানা স্থানে। বলাবাহুল্য, নবদ্বীপে পূজিত সোনার গৌরাঙ্গ মূর্তিটি শান্তিপুরের ব্রজলাল দাসের তৈরি।

চিৎপুরের নতুনবাজারের তিনকড়ি দাসের তৈরি রথ, বর্ধমানের বনকাটির গোপাল ঠাকুরের রথ, মেদিনীপুরের রামগড় আনন্দপুরে রাধারমণের রথ, বাঁকুড়ার হদলনারায়ণপুরের মণ্ডল পরিবারের রথ, পুরুলিয়ার চকবাজারে হরিদাসী বৈষ্ণবীর রথ তার সৌন্দর্য নিয়ে উচ্চ মর্যাদা পেয়েছে। লোহার ফ্রেমে কিংবা পিতলের দণ্ডের উপর নির্মিত রথে পিতলের নকশাপাত লাগানো ও চূড়া বিশিষ্ট; সঙ্গে থাকে পিতলের নানা ধরনের ঢালাই মূর্তি। শুধু রথ নয়; অস্ত্রশস্ত্র তৈরিও হয়েছে। ঠাকুরের সাজ থেকে বলিদানের জন্য ও যাত্রাপালার প্রয়োজনে এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে পেতল ও লোহা এই দু' ধাতুরই আশ্রয় নিতে হয়েছে। বলিদানের খাঁড়া তৈরিতে নাম কেড়েছে মেদিনীপুরের কেশয়াড়ি থানার সঁতড়াপুর, রামদা নির্মাণে নদীয়ার লাউফলী, বাঁকুড়ার পাত্রসায়েরের টাঙ্গা ও টাঙ্গি, বর্ধমানে বনপাশে তৈরি হতো ম্যাচলক-বন্দুক। পিতলের দেশি কামান নির্মাতা ব্রজকিশোর দাসের নামটি উজ্জ্বল হয়ে আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংরক্ষিত নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ব্যবহৃত পিতলের কামানটির গায়ে। মোগলদের অর্থসাহায্যেও নির্মিত হয়েছিল অনেকগুলি ছোটো-বড়ো কামান। পাশাপাশি তরবারি, বর্শা, গদা, ছুরি, লোহা কাঠের বিষাক্ত বাণ, ধনুর্বাণ এগুলির নির্মাণ তো ছিলই। এতো রথের সঙ্গে যুদ্ধের সাজ। রথের সঙ্গে শোভাযাত্রার সাজও ছিল। গানবাজনাই প্রধান ছিল। গান-বাজনার জগতে নাম কেড়েছে নবদ্বীপের করতাল ও কাঁসি, মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার শিঙ্গা, হুগলির খোলশড়ার ঘুঙ্গুর। গোরুর গাড়ির ঝোলানো ঘণ্টা পাওয়া যেত কালীঘাটে আর পেটাঘড়ির ঘণ্টা মিলতো কলকাতায়।

একসময় দুধ দোহনের বালতি থেকে দুধ খাওয়ার বাটি হতো পিতলের কিংবা কাঁসার। ঢেউ খেলানো পাতের ভেতর ধাতুর বল ঢুকিয়ে তৈরি হতো নুপুর। কাঁসা-পেতল নিয়ে কাঁসারি ও কর্মকার সম্প্রদায়ের অষ্টলই গোষ্ঠী-সহ গড়নদার, ঝালাইদারদের একসময় ছিল রমরমা বাজার। বিয়ে ও পুজোর মরশুমে ব্যস্ত থাকতে হতো শখের গড়ন বা রূপটি তুলে ধারার চেষ্টা নিয়ে। ধাতু গলানোর স্থান 'শাল' প্রস্তুত, ধাতু গলানোর পাত্র 'মুচি' প্রস্তুত, ছাঁচ প্রস্তুত, তরল ধাতু শক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটানো কাটা বাঁকানো, কালো রং 'ছিলকে' তোলা, মসৃণ পালিশ করার মতো নানা কাজের মধ্য দিয়ে শিল্প বস্তুটি তার গড়ন পায়।

লোহার কাজের জন্য প্রস্তুত কামারশালায় লোহাকে পুড়িয়ে লাল করার জন্য চলে ঘনঘন ছাগলের চামড়ায় প্রস্তুত হাপরে টান। এখন মোটরচালিত পাখা এসে গেছে। পাশেই পোঁতা থাকে ভারী নিরেট লোহার টুকরো। এ স্থানে রেখেই পেটানোর কাজ চলে। সঙ্গে থাকে জলপাত্র-সহ কাঠ ও লোহার নানা যন্ত্র বা সাহায্যকারী বস্তু। মূলত কৃষির মরশুমেই কামারশালাগুলিতে ভিড় জমে। লাঙ্গলের ফাল, খড় কাটার বটি, কাস্তে, কাটারি, শাবল, নানা ধরনের কোদাল, দুনি, জোঙ্গা, গোরুর গাড়ির চাকার বেড়ি, নৌকো বাঁধার শিকল সবই লোহার তৈরি। লৌকিক প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গ দিয়েছে কামারশালার তৈরি শিল্পবস্তু। সাঁড়াশি, বটি, জাঁতি, ডালকাঁটা, কড়াই, ডাবু, তাওয়া এরকম গৃহস্থের নানা টুকিটাকি থেকে শখের কাজললতা, সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত শাশুড়ির দেওয়া নোয়া কিংবা ধর্মীয় প্রয়োজনে ত্রিশূল কিংবা জিভ ফুটো করার তীক্ষ্ণ কাঁটাটিও লোহার। হুড়কোর সাহায্যে বন্ধ একসময় সিঁড়িঘরের ঝুলন্ত গজাল দরজায় বসানোর রেওয়াজ ছিল। তৈরি হতো লোহার সিন্দুক। পাখির খাঁচা, ইন্দুর ধরার কল, মাছ ধরার কোঁচ ও বড়শিও কামারশালায় তৈরি।

বলাবাহুল্য, বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার বিভিন্ন গ্রামের মাছ ধরার বড়শি বেশ বড়ো এলাকার চাহিদা মেটায়। পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই ছড়িয়ে আছে কামার-স্যাকরাদের কামারশালা। সারা বছরই চলে ধার দেওয়া ও যন্ত্রাংশের ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত মেরামতি-সহ নানা কাজ। ভ্রাম্যমান জীবনে একসময় সঙ্গী হতো কলকাতার বাক্স, হাওড়ার তালাচাবি আর সঙ্গে হ্যারিকেন, লণ্ঠন কিংবা পিতলের হ্যাজাক। লম্ফ কিংবা প্রদীপ দীর্ঘ চলার পথের সঙ্গী হতে পারে না। কাঠি গোঁজা নারকেল খোলে প্রদীপ রেখে হাঁটাটা ছিল টর্চের স্বাদ মেটানো। ১৯০২ সাল নাগাদ বিষ্ণুপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন স্থানে কোনো এক মাড়োয়ারির কেরসিন ডিপোর খালি টিনগুলিকে লণ্ঠন রূপ দিয়েছিলেন রাইচরণ নামে কোনো এক ব্যক্তি। ওই অঞ্চলের গড়াই তেলি অর্থে কুলুরা কলের দাপটে খানি থেকে অনেকেই সরে গিয়ে আগুনে শিখা দানের কাজটি করতে গিয়ে বেছে নিলেন ওই টিনগুলিকেই। ছড়িয়ে পড়লো ছোটো বড়ো নানা আকৃতির লণ্ঠন ও লণ্ঠন তৈরির বিদ্যা। তারও এক প্রকার ইতি ঘটতে চলেছে বর্তমান বৈদ্যুতিক যুগে। কালির দোয়াত ও লম্ফ হয়েছিল একসময়। পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রাখতে রাখতে গিয়ে শ্রমিক শ্রেণী বারে বারে তার জীবিকার বদল ঘটিয়েছে। সাংস্কৃতিক চরিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়া। বদলে গেছে পুরুলিয়ার লোহারপাড়া থেকে কলকাতার কাঁসারিপাড়া। ঢেঁকিই নেই; ঢেঁকির মুখে লোহার পাত তৈরির প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে। সোনার চাদরে মেয়েরা লুকিয়ে রাখতে চায় হাতের নোয়াটি। মাঙ্গলিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত জাঁতি ও কাজললতা লোহার বদলে হচ্ছে রুপোর। একসময় ভুত-প্রেতের ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ই ছিল লোহা ধাতুটির সংস্পর্শে থাকা। লৌকিক প্রযুক্তি নির্ভর লোহার কৃষি যন্ত্রপাতিও তার প্রয়োজনীয়তা হারাচ্ছে। ট্রাক্টর, হার্ভেস্টর, হপার, সাবমার্সিবল এই আধুনিক শব্দগুলি কৃষকদের মুখে মুখে ঘুরছে। আর ঘরের ভেতর জায়গা করে নিয়েছে স্টেনলেস স্টিল, নন্‌স্টিক, অ্যালোমিনিয়ামের মতো কিছু নিত্য ব্যবহারের উপযোগী সস্তার ধাতুপাত্র। এই ধাতুগুলির থেকে তামা ও কাঁসা-পেতল বেশ চকচকে। কিন্তু বারে বারে ঘষে-মেজে উজ্জ্বল করতে হয়। তাই মনে ধরে না। বরঞ্চ মন কেড়েছে নানা ব্রান্ডের কাঁচ ও সিরামিকের বেশ কিছু সেট। কিন্তু এগুলি ধাতুর নয়। ■

ইতিহাসে উপেক্ষিত বেণুসাগর

কৌশিক রায়

ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার সীমান্তে, কোলহান অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আছে বেণুসাগর দেউলের পোড়ামাটির ইঁটের ধ্বংসাবশেষ, বেলেপাথর ও গ্র্যানাইটের তৈরি অনেকগুলি দেবদেবীর সুন্দর মূর্তিও পাওয়া গেছে এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে। লোকশ্রুতি আছে, কিষানগড়ের রাজা কেশনরের পুত্র রাজা বেণু এই মন্দির ও তার সংলগ্ন একটি দীঘি ও দুর্গ তৈরি করান। ব্রিটিশ আমলে সিংহভূম জেলার অন্যতম প্রশাসক ছিলেন কর্নেল জেমস টিকেল। তাঁর উদ্যোগে এই বেণুসাগর মন্দিরটির সংস্কারের কাজ শুরু হয়। স্থানীয় 'কোল' জনজাতির সাহায্যে কর্নেল টিকেল এই বেণুসাগর বা রাজা বেণুর মন্দির ও তার সংলগ্ন পুষ্করিণীর সংস্কার শুরু করেন। জানা যায় মারাঠা সেনাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রাজা বেণু এই সিংভূমে পরিবার-সহ পালিয়ে আসেন। আবার, আজ থেকে ২০০ বছর আগে মারাঠা সেনাপতি মুরারি রাওয়ের হামলার ফলে এই বেণুসাগর এলাকাটি পরিত্যক্ত হয়। ৬০০ গজ আয়তনের দীঘিটিও কর্নেল টিকেলের উদ্যোগে খনন করানো হয়।

এরপর বেণুসাগর মন্দির ও তার মধ্য থেকে প্রাপ্ত দেবদেবীর মূর্তিগুলি সম্পর্কে গবেষণা করার দায়িত্ব ইংরেজ পুরাতাত্ত্বিক পিটার জর্জ বেগ্‌লারকে দেওয়া হয়। বেগলার অনেক গবেষণা করে জানিয়েছেন বেণুসাগরের মন্দির ও মূর্তিগুলি নিঃসন্দেহে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের সময়ে গড়ে তোলা হয়েছিল। মগধের বুদ্ধমূর্তি এবং জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর, ঋষভ ও পার্শ্বনাথের মূর্তির আদলে এখানকার দেবদেবীর মূর্তিগুলি খোদাই করা হয়। সুতরাং, বেণুসাগর মন্দিরটিতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উপাসনা যে বেশি মাত্রায় হতো জানিয়েছেন ইতিহাসবিদরা। তবে, এই বেণুসাগর মন্দির থেকে পাওয়া, দণ্ডায়মান আর উপবিষ্ট মূর্তিগুলির সঙ্গে পশুপতিনাথ শিব,

মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, বিষ্ণু, কালী আর গণেশদেবেরও সাদৃশ্য পাওয়া গেছে। মূর্তিগুলির মধ্যে একটি গ্র্যানাইট নির্মিত হাতির পায়ের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। এই পা-টির সঙ্গে মহাবলীপুরমের মন্দিরগাত্রে দেবী গঙ্গার মর্ত্যে আগমনের খোদাই চিত্রে থাকা, দেবরাজ ইন্দ্রের হাতি ঐরাবতের সুগঠিত পায়ের সাদৃশ্য আছে। বেগলারের অভিমত অনুযায়ী বেণুসাগর মন্দিরটি ছিল বৌদ্ধ, জৈন এবং হিন্দু ধর্মের ত্রিবেণীসঙ্গম। এই মন্দির চত্বরে যে পোড়ামাটির ইটের পাঁজার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে সেগুলি জৈন ও বৌদ্ধস্তূপও হতে পারে। আশেপাশের কিষাণগড়, রুয়াম আর ইটাপুকরি গ্রামগুলো থেকেও অনেক জৈন ও বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ব্রিটিশ আমলে সিংহভূম জেলার সরকারি পরিসংখ্যানবিদ বা গেজেটিয়ার এল.এস.এস. ও' ম্যালোরি জানিয়েছেন, বেণুসাগরে এই মন্দিরের আশেপাশে অনেক সাধারণ জৈন মতাবলম্বী বা 'শ্রবক' বসবাস করতে শুরু করেন। ওড়িশার কলিঙ্গ (বর্তমান গঞ্জাম জেলা) থেকে জৈন এবং বৈষ্ণব ধর্মমতাবলম্বীরাও এই বেণুসাগরে যাতায়াত করতেন। ওড়িশার জৈন ধর্মাবলম্বী নৃপতি খারবেলের রাজ্য পরিসীমার অধীনে ছিল এই বেণুসাগর। জৈন ধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক এবং ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানও এসেছিলেন এই বেণুসাগরে তাঁর পদব্রজে ভারত ভ্রমণের সময়ে। 'হরিভদ্রীয় বৃত্তি' নামক প্রাচীন জৈন গ্রন্থে উল্লেখ আছে— জৈন সন্ন্যাসীরা কলিঙ্গ হয়ে

পরম্পরা

মগধে যেতেন গোরাথাগিরি (গয়ার বরাম্বর পাহাড়), রাজগীর এবং পাটলিপুত্র হয়ে। এই পথটি সিংভূম জেলার মধ্য দিয়েই বিস্তৃত। আরেকটি জৈন ধর্মশাস্ত্র পুস্তক 'আচারাঙ্গসূত্র'তেও সিংভূম জেলার উল্লেখ আছে। এই জেলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিকে জৈন শাস্ত্রে, প্রাকৃত ভাষাতে 'বজ্জভূমি' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

গৌড়রাজ ও পুষ্যভূতি রাজ হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে জয় পাওয়া শশাঙ্কের নিজস্ব ছাপ দেওয়া সিলমোহর পাওয়া গেছে বেণুসাগর থেকে। আবার, এই একই ধরনের সিলমোহর মিলেছে রোহটাসগড় থেকেও। ৬১৯-২০ খ্রিস্টাব্দে গঞ্জামের রাজা দ্বিতীয় মাধবরাজেরও অধীনে ছিল এই বেণুসাগর অঞ্চলটি। এই এলাকা থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত, ওড়িশার কেওনঝড় জেলার অন্তর্গত কিচাং থেকেও বেণুসাগরের মতো বেশ কয়েকটি দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। খ্রিস্টীয় ১০ম শতকে এই বেণুসাগর চলে আসে দাক্ষিণাত্যের অন্যতম নৃপতি রাজেন্দ্র চোলের অধীনে। পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে পালযুগের অন্যতম রাজা প্রথম মহীপালও এই বেণুসাগরে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অশোকগ্রাম ও প্রাণসাগরের নিকটবর্তী বটুন গ্রামে বসবাস করতেন সুলতান হুসেইন শাহ এবং নসরত সাহের পৃষ্ঠপোষকতা ধন্য 'রামচরিত' নামক মহাকাব্যোচিত গ্রন্থের লেখক কবি সন্ধ্যাকর নন্দী। তাঁর রচনাতে অপরমন্দার নামক একটি আরণ্যাঞ্চলের সামন্তরাজা লক্ষ্মীসূরের নাম আছে। তাঁর অধীনস্থ, সাঁওতাল পরগনার নয়া দুমকার অন্তর্গত কুজাহাটি এলাকার স্থানীয়রাজা সূরপাল ও মানভূম (পুরুলিয়া) জেলার তেলকূপি (তৈলকম্প) অঞ্চলের স্থানীয় রাজা--- রুদ্র-শিখর ও মানকির নাম পাওয়া যায়। এঁরা সকলেই বেণুসাগর এলাকাটির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

বেণুসাগরের নিকটবর্তী 'দেবস্থান' নামক এলাকাটি থেকে গ্র্যানাইট ও বেলেপাথরের তৈরি ৮টি শিবলিঙ্গ ও ৪টি বিষ্ণুমন্দিরের ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। বেশ কয়েকটি পাথরের খোদাই করা মূর্তিও পাওয়া গেছে এই 'দেবস্থান' এলাকাটি থেকে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

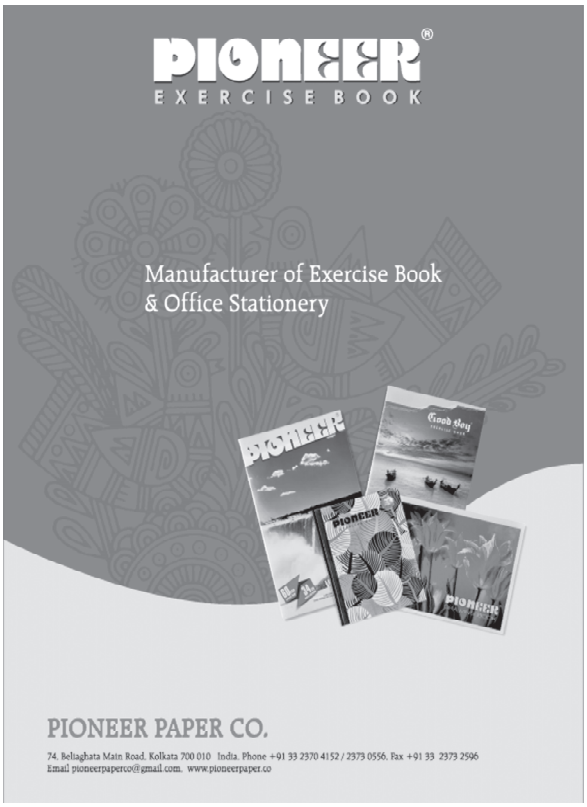

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

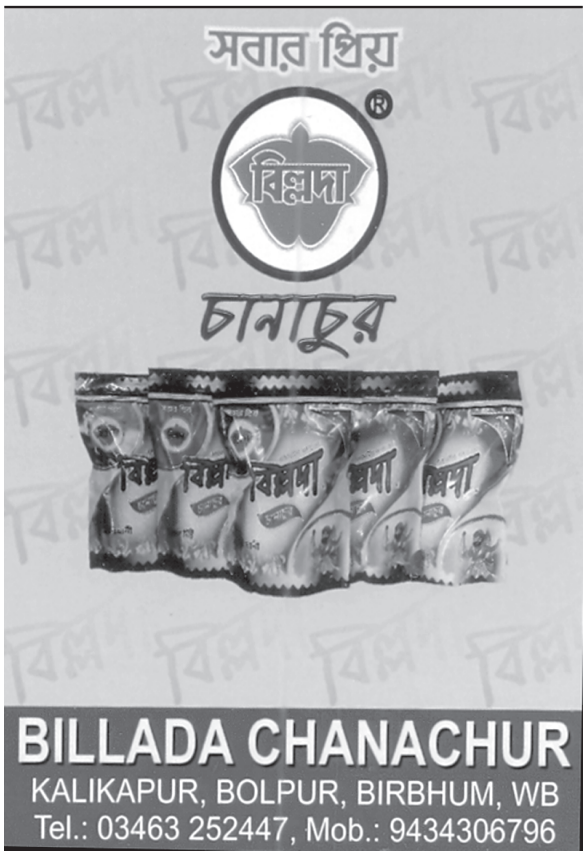

‘স্বচ্ছ ভারত’ এক মহৎ মিশন

শেখর সেনগুপ্ত

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনা অনেকটাই লজঝড়ে হয়ে আসে, যখন আমরা নরেন্দ্র মোদীর ‘স্বচ্ছ ভারত’ গঠনের গভীরতা ও সাফল্যের বিশ্লেষণ শুরু করি। এই উন্নয়ন সাময়িক নয়, এর বিস্তৃতিও ব্যাপক। সমালোচনা করার চেয়ে সহজকাজ আর দ্বিতীয়টা হয় না; অনেকের কাছে এটা আবার বেশ উপাদেয়, যেন চপ-পাকোড়া সমেত গরম চায়ে গলা ভেজানো। আমার অনুরোধ, একবার খোলা মনে বর্তমান সরকারের স্বচ্ছভারত অভিযানের অগ্রগতি নিয়ে ভাবুন, তথ্যাদি জোগাড় করুন। বট-অশ্বত্থের শিকড়ে থেকে থেকে ঘাই মারবার অভ্যেসটা কমে আসবে। কমবে অস্থির কিচির-মিচির করবার প্রবণতাও। স্বচ্ছ ভারত মিশনকে কেন অভিনব বলা উচিত, প্রথমে তার ব্যাখ্যা করব। তথ্যাদি চর্চা করে দেখেছি, স্যানিটেশন নিয়ে এত বিশাল উদ্যোগ বিশ্বের আর কোনোও দেশ আজ অবধি গ্রহণ করেনি। ভারতেও পূর্ববর্তী কোনও সরকারই এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ঘামাবার মতো বোধশক্তিও ছিল কিনা সন্দেহ। ৫৫০ মিলিয়ন গ্রামীণ জনতার উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের অভ্যেস তথা ঐতিহ্য থেকে বের করে আনা যে কত বড় কঠিন কাজ, তা ভাবতে গেলেও মাথা ঘুরে যায়। একটা সরকার হরেক স্কিমের পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজে মুনসিয়ানা দেখাতেই পারে, কিন্তু কোটি কোটি মানুষের আজন্মলালিত কুঅভ্যাসের পরিবর্তন আনার শপথ কোন কোন দেশের সরকার ইতিপূর্বে নিয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। ২০১৭ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশ মোতাবেক ‘কোয়ালিটি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া’ সংস্থা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়ে যে আস্ত রিপোর্টটি জমা দেয়, তাতে ছিল মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার পরিবারের কথা। সেই রিপোর্টকে ধরে আরও বিস্তারিত সমীক্ষা চালাবার পর সরকার যে ছবিটা পায়, তা কিন্তু বেশ উৎসাহজনক। বোঝা গেল, স্বচ্ছভারত মিশনের বিরামহীন প্রয়াসে এই দেশের ৯১ শতাংশ পরিবারে শৌচাগারের ব্যবহার বাস্তবায়িত হয়েছে।

কিন্তু মুশকিল হলো, উন্নয়নের এই ধারাকে অব্যাহত রাখা অত্যন্ত কঠিন কর্ম। এ রকম বিস্তর নিদর্শন আমাদের গোচরে এসেছে, বহু গ্রামাঞ্চলেই কিছু কিছু মানুষ আবার মাঠেঘাটে শৌচকর্মের সাবেক অভ্যেসে ফিরে গিয়েছে। অর্থাৎ এর সাফল্যকে ধরে রাখতে হলে দরকার এক ধারাবাহিক গণ-আন্দোলন। কেবলমাত্র সরকারি কানুনের ডানা-ঝাপটানিতে কাজ হবে না। তদনুযায়ী ২০১৭ থেকে শুরু করে এই ২০১৯ সনের শেষার্ধ অবধি চলেছে এক সার্বিক ও শশব্যস্ত গণজাগরণ প্রকল্প। মাঝে মাঝেই চালানো হয় সমীক্ষা। ইতিমধ্যে গ্রামীণ ভারতের ৩০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের বদঅভ্যেস থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে। এ আন্দোলন চলবে। চালাতেই হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন নরেন্দ্র মোদীর ন্যায় ঋজু ব্যক্তিত্বের ধারাবাহিক নেতৃত্ব। এই মুহূর্তে সারা ভারতের ৪ লক্ষ ২৫ হাজার গ্রামকে Open Defecation Free অর্থাৎ শৌচকর্মের রেওয়াজবিহীন রূপে আমরা মান্যতা দিতে পারছি। যে পাঁচটি রাজ্য এই বিষয়ে অন্যান্য রাজ্য থেকে এগিয়ে আছে, তারা হলো উত্তরাখণ্ড, সিকিম, কেরালা, হরিয়ানা এবং হিমাচলপ্রদেশ। প্রায় সংখ্যাতীত শৌচগার নির্মাণ করে দিয়েছে সরকার। হাতে মগ বা জলের ছোট বালতি ঝুলিয়ে মাঠে ময়দানে কিংবা ঝোপঝাড়ের দিকে দৌড়তে দৌড়তে চলেছে ওই লোকটা—এ রকম দৃশ্যের সংখ্যা প্রতিদিন কমছে। এটা কোনোও গুণিনের কেরামতিতে সম্ভব হয়নি; সম্ভব হয়েছে সরকারি অনুপ্রেরণায় সংগঠিত এক সর্বভারতীয় গণআন্দোলনে— যাকে আরও অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে।

কেবল কতগুলো শৌচাগার তৈরি করা হলো, সেই পরিসংখ্যান নিয়ে আত্মতুষ্টির অবকাশ এখানে নেই। দেখতে হবে, মগ হাতে ছোটাছুটি করা লোকের সংখ্যা কতটা কমেছে। আরও সোজা কথায় এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে সাধারণ মানুষকেও। সরকারি প্রকল্প, অতএব আমি যমন আপন পরিবারকে নিয়ে গুড়িশুড়ি মেরে থাকি, তেমনটিই থাকব, এই ধরনের মানসিকতা ত্যাগ করতেই হবে। সমাজ উন্নয়নে আমি নিজে যদি যুক্ত না হতে পারি, আমার নিজস্ব অন্তর্লোকেই আলোর চেয়ে অন্ধকারের প্রাধান্য থাকবে অধিকতর। বিশেষ লক্ষণীয় যে, প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছভারত মিশনকে সফল করতে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ ব্যাপকতর। ২০১৭ সনের আন্তর্জাতিক নারীদিবসে নরেন্দ্র মোদী তথ্যসহ এই কথা জানিয়েছেন। ৬ হাজার মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানদের এক জমায়েতে তিনি দেশের মাতা, ভগ্নী এবং কন্যাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং এই আন্দোলনে পুরোধা ১০জন মহিলাকে ‘স্বচ্ছতা চ্যাম্পিয়ান’ পুরস্কারে ভূষিত করেন।

তাছাড়া বর্জ্যপদার্থকে সঠিক পদ্ধতিতে পরিশোধিত করতে পারলে তা যে কৃষিভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠবে, প্রধানমন্ত্রী বারংবার তা উল্লেখও করেছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বচ্ছভারত মিশন এমন এক কর্মসূচি, যাকে সফল করবার জন্য দেশের তাবৎ সরকারি মেশিনারিকেই কাজে লাগান হচ্ছে। কর্পোরেট দুনিয়াকেও দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল সূচনামুহূর্তেই। সেই আবেদনে সবচেয়ে জোরালোভাবে টাটার অছি পরিষদ (Tata Trust) সাড়া দিয়েছে। শুধুমাত্র এই কাজে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে টাটা কোম্পানি ৬০০ জন পেশাদারকে নিয়োগ করে এবং বহু জেলা প্রশাসন তাঁদের সহায়তা পেয়ে এতই মুগ্ধ হয় যে তাদের বাক্যস্ফূর্তিরও যেন অবকাশ থাকে না। অথচ সরকারের সঠিক বা বেঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনার ঝড় তোলা যাঁদের নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যেস, তাঁরা নিশ্চুপই থাকলেন। গণতান্ত্রিক সুস্থতাকে লয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে যুগপৎ সমালোচনা ও সমর্থন দুয়েরই যে দরকার, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন স্টুয়ার্ট মিল বহু বছর আগেই তা বলে গিয়েছেন।

‘স্বচ্ছ ভারত মিশন’ আন্দোলন সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৯ তারিখ অবধি ৬,৭৯,৩৩,৯৬৩ টিরও বেশি শৌচালয় তৈরি করে দিয়েছে ৩, ৩২,৭১৯ টি গ্রামীণ লোকালে। এটা অবশ্যই এক অচরাচর নজির। স্বচ্ছ সংকল্প থেকে স্বচ্ছ সিদ্ধিলাভ এই ভাবেই দ্রুততার সঙ্গে অর্জিত হতে চলেছে নরেন্দ্র মোদীর সবল পৌরোহিত্যে। আমরা আশাবাদী, সেই দিন খুব বেশি দূরে নয়, যখন ভারতের প্রতিটি গ্রাম চরিত্রে ও পরিচ্ছন্নতায় এক একটি পঞ্চবটী হয়ে উঠবে। ■

নাগরিক সংশোধন আইনের বিরোধিতা করে ভোটব্যাঙ্ক ফিরে পাওয়ার রাস্তা খুঁজছে বিরোধীরা

বিনয় সহস্রবুদ্ধে

দেশের উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু অত্যন্ত সময়োপযোগী মনে করে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও জাতীয় জনসংখ্যার তথ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় দুটি নিয়ে তীব্র চুলচেরা বিতর্কে অংশ গ্রহণ করার এক আবেগঘন আহ্বান জানিয়েছেন। নজর দিলেই দেখা যাচ্ছে উল্লেখিত বিষয় দুটি নিয়ে বিক্ষোভ নিছক কুমতলবের রাজনীতি প্রণোদিত। দেশের নাগরিকদের বিশাল অংশের এ বিষয়ে অজ্ঞতা বিক্ষোভকারীদের প্রয়াসে সার জল দিয়েছে। যার ফলে এঁরা মানুষের মনে অনাবশ্যক ভীতি ও এক ধরনের অনির্ণেয় মানসিক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই উন্মাদনারও একটি নির্দিষ্ট ছক রয়েছে। এই বিলকে ঘিরে কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলি হঠাৎ সেই পুরনো ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার জিগির তোলার একটা মওকা পেয়ে গেছে বলে ধরে নিয়েছে। একটা সময়ে এই ধর্মনিরপেক্ষতার কৌশল প্রয়োগ করে তারা ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির দক্ষ খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু বিখ্যাত 'সাহবানু খোরপোশ মামলা' ও অযোধ্যা আন্দোলনের পর কংগ্রেস ও অন্য দলগুলির মধ্যে একটা আবছা ভিন্ন সংকেত দেওয়া শুরু হয়। ৯০-এর দশকের শেষাশেষি যখন সমাজতন্ত্রের রমরমা ঝিমিয়ে পড়ল সে সময় কংগ্রেসের দলছুট নেতা শরদ পাওয়ার যিনি তাঁর নতুন গোষ্ঠীর নাম সমাজবাদী কংগ্রেস রেখেছিলেন তা বদলে ১৯৯৯-এ জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস (এনসিপি) করে দেন। মূল কংগ্রেস দল পরিস্থিতি দেখে শুনে মিডিয়ার ভাষায় হালকা হিন্দুত্বের দিকে ঝোঁকে। এই সূত্রে গত বছরের মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ইস্তাহারে 'রাম বনগমন পথ' সন্ধানের উল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এইসব 'কসমেটিক চেঞ্জ' কোনো কাজে আসেনি। ফলে ভারতের অতি প্রাচীন কংগ্রেস দল সম্পূর্ণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে চিরঅভ্যস্ত ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিকেই আবার আঁকড়ে ধরেছে।

মোটামুটি বিজেপি ছাড়া সমস্ত দলই মুসলমানদের নেহাতই মামুলি ভোটব্যাঙ্ক হিসেবেই গণ্য করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। আজকে এটা আবাক হওয়ার ব্যাপার নয় যে নবীন প্রজন্মের সংখ্যালঘু ছেলে-মেয়েরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা অন্য সম্প্রদায়ের মতোই পোষণ করে। জম্মু-কাশ্মীরে এখন নতুন শিল্পোদ্যোগ শুরু হয়েছে। মুসলমান মেয়েরা এখন ন্যায়সঙ্গতভাবেই সমান সম্মান এবং অন্যায়ের হাত থেকে নিরাপত্তা দাবি করতে পারে। কিন্তু ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে কেন্দ্র করে একটা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রাসঙ্গিক থাকতে ব্যাপক ভুয়ো প্রচারের ঢেউ তুলে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সংখ্যালঘুদের এই মিথ্যার জালে আবদ্ধ রাখার কৌশল তিনটে নির্দিষ্ট কারণে মুখ থুবড়ে পড়বে। (১) লোকে যত এই আইনের গভীরে ঢুকবে ততই স্বাভাবিক অবস্থা দ্রুত ফিরে আসবে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নির্দিষ্ট তিনটি দেশের ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত মানুষদের ভারতে বসবাসের অধিকার ত্বরান্বিত করার আইন। এটিই সারবস্তু। দেশের প্রচলিত আইনে বিশ্বের যে কোনো দেশ থেকে আসা মানুষকে (মুসলমান-সহ) ভারতে ১১ বছর বসবাসের পর নাগরিকত্ব দেওয়া হতে পারে। নির্যাতিত শরণার্থীদের ক্ষেত্রে এই বসবাসের সময়সীমা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেননা তারা দীর্ঘদিন ধরেই এখানে বসবাস করছে। সহজ কথায় বৈষম্য হলেও এটি ইতিবাচক বৈষম্য। সমাজে মেয়েদের, শারীরিকভাবে অপটুদের বা নিতান্ত প্রান্তিক মানুষদের যেমন বিশেষ সুবিধে প্রদান করা হয় এটা প্রায় তারই সমতুল। যে কারণেই দেশের প্রধানমন্ত্রী ও গৃহমন্ত্রী শাহ বলেছেন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের অন্তর্গত ধারাগুলি নিয়ে দেশের মানুষের বিন্দুমাত্র চিন্তার কারণ নেই।

(২) সংখ্যালঘু বিশেষ করে মুসলমানদের বোকা বানানো এখন কঠিন। প্রথম এনডিএ সরকারের আমলেই মাদ্রাসাগুলিতে প্রথম কম্পিউটার প্রচলিত হয়, একথা তারা জানে। একইভাবে মোদী সরকারের একনিষ্ঠ দৃঢ়তায় আদালতে তিন তালাক প্রথা রদ হয়ে যায়। মুসলমানদের মধ্যে সরকারি সাহায্যে উদ্যোগপতি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সংখ্যালঘুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনই প্রথম করে তাদের সরকার নিছক বাঁধা ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে গণ্য করে না।

(৩) ধীরে হলেও মুসলমানরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছে আজকে জাতিগত পরিচয়কে ছাপিয়ে আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ খোঁজাই গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রমাণ এতদিন চিরাচরিত বিশ্বাস অনুযায়ী তিন তালাক রদ, ৩৭০ ধারা বিলোপ বা অযোধ্যায় সর্বোচ্চ আদালতের রামমন্দির নির্মাণের রায়ের বিরোধিতায় মুসলমানরা ঝাঁপিয়ে পড়বে— সে ধারণা ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। এ কথার মধ্যে এখন আর কোনো সত্য নেই যে মুসলমান তরুণরা তাদের প্রজন্মের তরুণীদের জন্য সম সম্মান, নিরাপত্তা ও সম সুযোগ প্রত্যাশা করে না। শেষকালে যারা এই আইনটির বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে সরকারের সমালোচনা করছেন তাঁদের কিছু শিক্ষণীয় আছে।

তাঁদের বক্তব্য সরকার জনতার মতামতকে বিলকুল অগ্রাহ্য করছে। প্রবাদ প্রতিম ইংরেজ বাগ্মী এডমন্ড বার্ক বলেছিলেন— "Your representative owes you not his industry (শ্রম) only but his judgement, and he betrays instead of serving you if he sacrifices it to your opinion." মহা মূল্যবান কথা। মোদী একজন প্রাজ্ঞ নেতার মতোই তাঁর বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে দেশবাসীর বৃহত্তর কল্যাণে কাজ করে চলেছেন।

(অনুবাদক : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়)

পরিবর্তন

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যাবেলা আলো ঝলমলে সানডে ক্লাবের প্রধান প্রবেশ পথের সামনে এসে ঘ্যাঁচ করে থামলো লাল রঙের চক্‌চকে হুন্ডাই গাড়িখানা। গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে রাস্তায় পদার্পণ করলেন সমীরণ গাঙ্গুলি, বর্তমানে প্রথিতযশা সাহিত্যিক। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পুরস্কারও লাভ করেছেন তিনি। বয়স ষাট ছুঁইছুঁই, মাঝারি উচ্চতা, মেদবহুল চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা বাবরি চুল ঘাড় অবধি বিস্তৃত। চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা, পরনে ধপধপে সাদা সদ্য পাটভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবি, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। চারপাশে একবার অবলোকন করে মৃদু হেসে ধীর পদক্ষেপে ক্লাব প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন তিনি।

প্রথমেই সাংবাদিক তড়িৎ সেনের মুখোমুখি হলেন। তড়িৎ বলল, দাদা কাল আপনার নির্বাচিত উপন্যাসগুচ্ছ প্রকাশ হলো শুনলাম। মৃদু হেসে সমীরণ বললে, হ্যাঁ, কলামন্দির হলে অনুষ্ঠানটি হলো। তোমাদের হাউস থেকে একজন রিপোর্টার গিয়েছিল দেখলাম।

তড়িৎ বলে, হ্যাঁ আমার কলিগ অর্ণব গিয়েছিল।

সমীরণ বলে, একজন ফিল্ম ডিরেক্টর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ওই উপন্যাসের থেকে একটা ফিল্ম বানাবে বলে।

তড়িৎ বলে, ভেরি গুড নিউজ দাদা।

সমীরণ বলে, তবে এটা একেবারে প্রাথমিক স্তরের কথাবার্তা।

ডিরেক্টরদের তো আবার কখন কী খেয়াল চাপে বলা যায় না। এখনতো আবার সাহিত্যিকদের গল্প নিয়ে সিনেমা করার চল অনেকটা কমে গেছে।

তড়িৎ বললে, তবে, ইদানীং কয়েকজন আবার ভালো গল্প- উপন্যাস নিয়ে ফিল্ম করছেনও।

—হ্যাঁ, সেইরকমই শুনেছি।

তড়িৎ বলে, দাদা আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল। সমীরণ গাঙ্গুলি ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বললে, জরুরি কথাটা যদি খুব জরুরি হয় তাহলে নির্দ্বিধায় বলে ফেল।

তড়িৎ বলে, সপ্তাহখানেক আগে শিল্পমন্ত্রীর বাড়িতে আইটি রেড হয়। এই নিয়ে মিডিয়ায় খুব হৈচৈ হয়। ওদের এমপি-রা এই ইস্যুতে পার্লামেন্টে তুমুল হট্টগোল করে।

এ বিষয়ে যদি আপনার ওপিনিয়নটা দেন...।

এই কথা বলে তড়িৎ পেন আর নোটবুকটা বের করে।

সমীরণ গাঙ্গুলি নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা

করেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, হ্যাঁ, এটা এক ধরনের প্রেসার ট্যাকটিক্স, বিরোধী মতাবলম্বীদের ভয় দেখানো। কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তার বাড়িতে রেড করানো, এটা আমি সমর্থন করি না। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই কলেজ স্কোয়ারে এই নিয়ে জমায়েত করবো। তড়িৎ খস্‌খস্‌ করে নোটবুকে সমীরণ গাঙ্গুলির বক্তব্য নোটবন্দি করল। ধন্যবাদ দাদা— বলে তাঁর প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করলে। সমীরণ গাঙ্গুলি মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে অন্যদিকে পা বাড়ালেন।

পকেট থেকে রথম্যানসের প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট ঠোঁটস্থ করে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। একটা তৃপ্তির ধোঁয়া ছেড়ে বার কাউন্টারের দিকে এগোতে যাবেন এমন সময় সেটকো স্টিলের এমডি মিস্টার গৌতম দাশগুপ্তর স্ত্রী মিসেস দাশগুপ্ত হন্তদন্ত হয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। লিপস্টিক রঞ্জিত ওষ্ঠে একটা মোহময়ী হাসি হেসে ব্যাগ থেকে সমীরণ গাঙ্গুলির সদ্য প্রকাশিত ঝকঝকে গ্রন্থটি বের করে বলেন, 'এক্সকিউস মি স্যার, কাইন্ডলি আপনার লেখা বইয়ে যদি একটা অটোগ্রাফ দেন...। সমীরণ গাঙ্গুলি বুকপকেট থেকে পেনটা বের করে দাঁতে সিগারেটটা চেপে ধরে বলেন, বইটা দিন।

তারপর কয়েকটা কথা লিখে সই করে বইটা ফেরত দিলেন।

মিসেস দাশগুপ্ত বিগলিত হয়ে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আমি আপনার একজন ফ্যান। আপনার লেখায় বিশেষ করে মহিলাদের বেদনা, তাদের সমস্যা এবং সংগ্রামের কথা যেভাবে ফুটিয়ে তোলেন তার তুলনা হয় না।' তাঁর একনিষ্ঠ পাঠিকার মুখে একথা শুনে সমীরণ গাঙ্গুলির হাসিটা চওড়া হলো।

বার কাউন্টারে গিয়ে একটা বিয়ারের গ্লাস তুলে নিয়ে ঘরের এক কোণে একটা সোফায় বসে মৃদু মৃদু চুমুক দিতে লাগলেন। এমন সময় সাহা পাবলিকেশনের কর্ণধার শঙ্কর সাহা দূর থেকে সমীরণ গাঙ্গুলিকে দেখে এগিয়ে এলেন। প্রবীণ মানুষ, সাফারি স্যুট পরনে, মুখে সযত্ন লালিত ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করলেন— কী সমীরণ কী খবর?

সমীরণ গাঙ্গুলি সবিনয়ে উত্তর দিলেন— আপনাদের আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে।

শঙ্কর সাহা বলেন— ও হ্যাঁ, বাই দি বাই আমাদের হাউস থেকে যে পেরিয়েডিক্যাল ম্যাগাজিনটা বেরোয় সেখানে তোমার ধারাবাহিক উপন্যাস বেরোবে নাকি শুনলাম।

—হ্যাঁ শঙ্করদা, সামনের মাস থেকে বেরোবে।

—তা কী থিম নিয়ে লিখছ?

—নকশাল পিরিয়ডের শেষ পর্ব থেকে কংগ্রেস, বামফ্রন্ট জমানা হয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত টাইম স্প্যানটা নিয়েই লিখবো।

—তা বেশ। বললেন শঙ্কর সাহা।

এক চুমুকে বিয়ারের তলানিটা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন সমীরণ। শঙ্কর সাহা তাঁর পিঠে আলতো টোকা দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, পরে আবার এনিয়ে কথা হবে। এই বলে তিনি এগিয়ে গেলেন।

ঠিক এই সময় সমীরণের পরিচিত কয়েকজন বন্ধুবান্ধব হৈহৈ করতে করতে তার দিকে ধেয়ে এল। অশোক বললে, 'সেই তখন থেকে তোকে খুঁজছি। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। এর মধ্যে নির্মল হুইস্কির পানপাত্রটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

সমীরণ বলে,— আরে এইমাত্র বিয়ার খেলাম।

নির্মল বলে— হুইস্কি আফটার বিয়ার নো ফিয়ার।

সমীরণ মৃদু হেসে পানপাত্রটি গ্রহণ করলে।

অশোক বলে চল লনে যাই অনেক কথা আছে। ওরা দল বেঁধে হৈহৈ করতে করতে আলো ঝলমলে, সাজানো গোছানো ক্লাব লনে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখানে সমাজের নানান স্তরের, নানান পোশাকের অভিজাত লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা ফাঁকা দেখে এক কোণের দিকে চলে গেল।

অশোক সমীরণকে বলল, 'আগামী মাসের বাইশ তারিখ রবিবার। ওই দিন তুই ফাঁকা আছিস তো?'

সমীরণ বলে, কেন রে, কী ব্যাপার?

অশোক বলল, 'ওই দিন চিংড়ি-ইলিশ উৎসবের উদ্বোধন আছে। তোকে প্রধান অতিথি করা হবে। মৎস্যমন্ত্রীও আসবে।

সমীরণ কিছুক্ষণ চোখ বুজে উঁ-উঁ-উ-উ করতে করতে ভাবে। তারপর চোখ খুলে বলে— হ্যাঁ, ওইদিন ফ্রি আছি।

অশোক এবার চোখ টিপে একটু চাপা গলায় বললে, টিভি সিরিয়াল এবং ফিল্মের অভিনেত্রী অদ্রিজা সোমও আসবে।

একথা শুনে সমীরণ একগাল হাসে।

তোর সঙ্গে তো অদ্রিজার খুব ইনটিম্যাসি আছে শুনেছি। সেদিন তো প্রবীর বলল কোন ম্যাগাজিনে এসব নিয়ে লিখেছে। ফেসবুকে আবার এই নিয়ে কয়েকটা সিমও বেরিয়েছে।

সমীরণ তখন অশোকের পিঠে আলতো একটি চাঁটি মেরে বলে, তুই তো দেখছি গুগ্‌ল পারসনিফায়েড। অনেক খবরই রাখিস।

—অদ্রিজার তো ডিভোর্স হয়ে গেছে শুনলাম। বাই দি বাই ও নাকি নেক্সট বিধানসভা ইলেকশনে নমিনেশনও পাচ্ছে।

সমীরণ চোখ বুজে বলে, 'সবই তাঁর ইচ্ছা।' এবার তার নেশাটা আস্তে আস্তে জমছে। রাত ক্রমশ গাঢ় হয়। একজন দুজন করে ক্লাব ছাড়তে থাকে। আবার, অনেক রাতের অতিথিও ক্লাবে প্রবেশ করে। সমীরণ এবার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

গাড়িটা যেখানে পার্ক করে রাখা আছে সেখানে গিয়ে মুস্তাফার সঙ্গে দেখা। মুস্তাফা সেলাম করে বলে, স্যার আপনার গাড়িটা ঝেড়ে মুছে সাফ করে দিয়েছি। সমীরণ মানিব্যাগ থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, মুস্তাফা কী খবর তোমার?

মুস্তাফা বলে ভালো নয় স্যার। বউটা ক্যানসারে ভুগছে। কালই হাসপাতাল থেকে জবাব দিয়ে দিল। বাড়িতে এনে রেখেছি।

—তা এখন আছে কেমন?

—একদম ভালো নেই স্যার, খুবই দুশ্চিন্তায় আছি। এদিকে অনেক ছুটি নেওয়া হয়ে গেছে। বলেছে আর ছুটি নিলে চাকরি থাকবে না। কী যে করি স্যার।

—সমীরণ বলে, দেখছি কী করা যায়। পরে যোগাযোগ করো।

মুস্তাফা সেলাম করে বলে, একটু দেখবেন স্যার।

গাড়িটা স্টার্ট দেয়। ধীরে ধীরে মূল শহর ছেড়ে বাইপাসের ওপর ওঠে। এবার গাড়ির গতি বৃদ্ধি হয়। কলকাতার উপকণ্ঠে এক অভিজাত আবাসনের দশ তলায় সমীরণ গাঙ্গুলির ফ্ল্যাট। স্ত্রী অমিতা একটি বহুজাতিক সংস্থার উচ্চপদে আসীনা। দুই কন্যা পড়াশোনা উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের বাইরে থাকে। সমীরণ

কলকাতার নামকরা ইন্টিরিয়র ডিজাইনার কুণাল মুখার্জিকে দিয়ে ফ্ল্যাটের ইন্টিরিয়রের কাজটা করিয়েছিল। দামি আসবাবপত্র দিয়ে ভেতরটা সাজানো।

সমীরণ গাড়ির জানালায় মধ্য দিয়ে রাতের কলকাতার চলমান দৃশ্য উপভোগ করে। দূরে একের পর এক গগনচুম্বী অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। নানারকম তাদের নাম ইলোরা, পরমা, মেঘবালিকা। সত্যি কলকাতা কত বদলে যাচ্ছে!

সমীরণ চোখবুজে সিটে হেলান দিয়ে মাথাটা পেছনে এলিয়ে দেয়। ভাবে বর্তমানে বাংলাভাষার কদর ক্রমশই কমছে। কিন্তু আবাসনের নামগুলো এখনো বাংলায় হয়। গত বছর কলকাতা বইমেলায় বাংলাভাষার এই দুর্দশা নিয়ে তার ভাষণ খুব প্রশংসিত হয়েছিল।

সময়টা আস্তে আস্তে পেছিয়ে যায়। মনে পড়ে সেই ঝোড়ো উত্তাল দিনগুলোর কথা। তখন যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্র সে। লিটিল ম্যাগাজিনে একের পর এক তার কবিতা বেরোচ্ছে। আর অন্যদিকে দিনবদলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে মিছিলে, বিক্ষোভে, স্লোগানে কলকাতার মাটি কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তার লেখা একটা কবিতা খুব জনপ্রিয় ছিল বন্ধুমহলে— 'রক্তে আগুন জ্বালাও বন্ধু দুর্জয় প্রতিবাদে'। তার সঙ্গে গলায় গলায় বন্ধু ছিল মতি। খুব ভালো গান গাইত। মঞ্চে উঠে সে যখন উদাত্ত গলায় গেয়ে উঠত 'এস মুক্ত কর, এস মুক্ত কর অন্ধকারের এই দ্বার;' তখন তার সারা শরীরে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ জাগত। একগাল দাড়ি, মাথায় উসকো খুসকো চুল মতি দমদমের একটা উদ্বাস্তু কলোনিতে থাকতো। একবার ধর্মতলায় প্রবল বিক্ষোভ মিছিল। মতি আর সে মিছিলে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিল। বেলা বাড়তে বিক্ষোভ ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠল। পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ করল, তারপর কাঁদানে গ্যাস, তারপরই চলল গুলি। কয়েকজন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। সমীরণ বন্দি হয়ে জেলখানায় গিয়ে শুনলো তার মধ্যে একজন মতি। পরদিন মতির মরদেহে মালা দিতে গিয়ে তার দুচোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় আচমকা একটা ঝাঁকুনিতে সে সম্বিৎ ফিরে পেল।

ড্রাইভার প্রেম সিং জানালো, বাবু বাড়ি এসে গেছি।

সমীরণ গাঙ্গুলি কোনোরকমে গাড়ির দরজা খুলে দেখলে, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, আকাশটা ঘোর করে আছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। প্রেম সিং বললে, তাড়াতাড়ি ঘরে চলে যান বাবু খুব শীগগির ঝড় উঠবে। সমীরণ টলতে টলতে গিয়ে লিফ্‌টে উঠে দশ নং বোতামটা টিপলো। পকেট থেকে হাতড়ে হাতড়ে ফ্ল্যাটের দরজার চাবিটা বের করলো। তখনো স্ত্রী অমিতা ফেরেনি। দরজা খুলে ঘরের আবছা আলোয় আয়নার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে সে। বলে ওঠে, কে? কে তুমি?

অল্প বয়সি ছেলেটা বলে, আমায় চিনতে পারছিস না, আমি সমীরণ গাঙ্গুলি।

—এ্যাঁ, সেকি! আমার নামও তো সমীরণ গাঙ্গুলি।

—তুই এখানে কী করে এলি?

ছেলেটা শুনে হাসতে লাগল। তারপর বললে, কী করে তোর ঘাড়ে গর্দানে এত চর্বি জমলো রে?

সমীরণ গাঙ্গুলি ছেলেটার স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দাঁতে দাত চেপে বলে, ইটস্ নান অব ইয়োর বিজনেস।

ছেলেটা ওসবে পাত্তা না দিয়ে বলতে থাকে, মনে পড়ে তোর দমদমের খুলনা কলোনিতে মতিদের টালির চালের ঘরে বসে পুরোনো মুক্তির ডাক কাগজের ওপর লাল কালি দিয়ে পোস্টার লিখতিস। ওর বোন স্বপ্না চায়ের কাপটা তোর সামনে নিয়ে এলে তুই এমনভাবে নিতিস যাতে তোর আঙুল স্বপ্নার আঙুলকে স্পর্শ করে। তোর শরীরে শিহরণ জাগতো। সমীরণ গাঙ্গুলি অবাক হয়ে গেল। কী করে সে একথা জানলো!

ছেলেটা আবার বললো, মনে পড়ে সেই কবিতা যা তুই আবৃত্তি করতিস।

'হে মহামানব, আর এ কাব্য নয়,
এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো,
পদ-লালিত্য ঝংকার মুছে যাক
কড়া গদ্যের হাতুড়িকে আজ হানো।'

সাহিত্যিক সমীরণ গাঙ্গুলির তখন ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। কী বলবে সে ভেবে কূলকিনারা পেল না। রোগা ছেলেটা বলেই চলে, তুই ভেবেছিলি পেশাদার বিপ্লবী হবি, সমাজটাকে বদলে দিবি। তার বদলে তুই নিজেই বদলে গেলি। দল যখন ক্ষমতায় এল তুই বর্ণমালা প্রকাশনে চাকরি নিয়ে বোম্বে মানে আজকের মুম্বাই চলে গেলি, তারপর পৃথিবীর এদেশ ওদেশ ঘুরে যখন ঘরে এলি, তুই তখন অন্য মানুষ। তোর চোখে তখন রক্তিম স্বপ্ন। জীবনে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে তুই ধাপে ধাপে ওপরে উঠতে শুরু করেছিস। এমন সময় বড়োলোকের সুন্দরী মেয়ে অমিতা এল তোর জীবনে। তারপর থেকে তোর শরীরে আস্তে আস্তে চর্বি জমতে শুরু করল।

হ্যাঁরে সমীরণ, তুই এবার উন্নতির কোন সপ্তম স্বর্গে প্রবেশ করবি?

পেছন ফিরে এই জীবনটার দিকে কখনো তাকিয়েছিস? কোনোদিন স্বপ্নে মতিকে দেখিস? মনে পড়ে সেই সত্যকিঙ্করদাকে, জেলের ভেতর অত্যাচারে যার পা দুটো পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ক্রাচ নিয়ে মিছিলে হাঁটতো? তোর কি মনে পড়ে কখনো সেইসব দিন, সেইসব পাগলকরা, উথাল-পাথাল ঢেউ তোলা দিনগুলোর কথা?

মনে পড়ে মাঝরাতে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় তুই পড়ছিলি, 'Let the ruling class tremble at a Communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chain. They have a world to win. Working men of all countries unite.' লাইনগুলো তোর রক্তে শিহরণ জাগিয়েছিল। সারারাত তুই অস্থিরভাবে পায়চারি করেছিলি। ওরে সমীরণ তুই আবার সেই পুরানো দিনগুলোতে ফিরে আয়।

আয়নার ভেতরের ছায়ামূর্তিটা কায়ারূপ ধারণ করে তার দিকে এগিয়ে আসে। সাহিত্যিক সমীরণ গাঙ্গুলি চিৎকার করে বলে ওঠে, না-না-না-না আর কখনোই তা সম্ভব নয়। তুই চলে যা, তুই এখুনি এখান থেকে চলে যা। সে টেবিল থেকে জলের জগটা হাতে তুলে নিয়ে সজোরে আয়নার দিকে ছুঁড়ে মারে। ঝন্‌ঝন্ করে কাঁচগুলো ভেঙে পড়ে। সেই ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে যায়।

তখন বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। প্রবলবেগে হাওয়া বইছে, মুহুর্মুহু বজ্রের গর্জনে চারদিক কেঁপে উঠছে। জানালার পর্দাগুলো হাওয়ায় উথাল-পাথাল করে উড়ছে। সমীরণ গাঙ্গুলি পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে সারা ঘরময় ছুটে বেড়িয়ে বলে যাচ্ছে, না-না-না-না-না কখনো না, কখনো না। ▮

ওরে ভোঁদড় ফিরে আয়

ভোঁদড় স্তন্যপায়ী প্রাণী। খুব ছটফটে আর চটপটে এই প্রাণীটি। আগে সমতল বাঙ্গলার প্রায় সব জলাভূমিতেই এদের দেখতে পাওয়া যেত। এখন অতি দুষ্প্রাপ্য। গ্রামেগঞ্জে আছে কিন্তু শহর বা শহরতলী থেকে উধাও। কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন জলাভূমি নিউটাউন

প্রভৃতি অঞ্চলে ছিল খুব ভালো সংখ্যায়। কিন্তু আজ আর তার দেখা মেলে না। খাদ্যাভাবে আর জমির কীটনাশকের প্রভাবে জীবনহানি ঘটেছে এদের।

সাধারণত ভোঁদড় দু'রকমের। **সাধারণ ভোঁদড়** এবং **মসৃণ ভোঁদড়**। আর এক প্রকার ভোঁদড়ের দেখা মেলে যার নাম— **সামুদ্রিক ভোঁদড়**। সাধারণ ভোঁদড় বা মিষ্টি জলের ভোঁদড়ের ইংরেজি নাম দ্য কমন ইন্ডিয়ান অট। বিজানের পরিভাষায় বলে লুট্রা লুট্রা। সারা ভারতেই এদের দেখা যায়। অসমে বেশি সংখ্যায় রয়েছে। নদী, হ্রদ ও অন্যান্য জলাশয় এদের বিতরণ ক্ষেত্র। জল ও ডাঙ্গা— দু'জায়গাতেই এরা সমান স্বচ্ছন্দ। মিষ্টিজলের ভোঁদড় পাকিস্তান ও বাংলাদেশে অধিক সংখ্যক দেখা যায়। মাছই এদের প্রধান খাদ্য, তবে মাছের অভাব হলে ইঁদুর, কাঁকড়া, চিংড়ি, ব্যাং যা শিকার করতে পারে তাই খায়। এদের পোষ মানিয়ে অনেকে মাছ ধরার কাজে ব্যবহার করে। মাথা ও দেহ মিলিয়ে এরা দুই থেকে আড়াই ফুট আর লেজটা হয় দেড় ফুট। পায়ের আঙুল হাঁসের মতো। তেল চকচকে গা বলে জলে ভেজে না। নাকের দু'পাশে বড়ো বড়ো গোঁফ। এদের মুখশ্রী কিছুটা ভোঁতা ধরনের। ওজন সাত থেকে এগারো কেজি হয়। একবার পোষ মেনে গেলে প্রভুভক্ত হয়ে যায়।

মসৃণ ভারতীয় ভোঁদড়কে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে লিউট্রোগেল পারস্পিসিল্লাটা। ইংরেজিতে বলে দ্য স্মুথ ইন্ডিয়ানম অট। বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারা। স্বভাব রকমসকম একই। লম্বা দুই-আড়াই ফুট। ওজন দশ থেকে বারো-তেরো কেজি। শরীরের লোম অন্যন্ত চকচকে আর ঘন হওয়ায় চট করে দেখলে মনে হয় যেন পালিশ করা হয়েছে। নাকের ডগা ঠিক যেন চামড়ার পুঁটলি। ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো দু'ভাগ খাঁজকাটা। এরা যেকোনো পরিবেশ মানিয়ে নিতে পারে। সারা ভারতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। বাচ্চা হয় একবারে দুটি থেকে চারটি। জন্মের প্রায় তিরিশদিন পর বাচ্চার চোখ ফোটে।

সামুদ্রিক ভোঁদড় সাধারণ ভোঁদড়ের নিকট আত্মীয়। গণ আলাদা। ইংরেজি নাম সী অট। অন্য নাম এনহাইড্রা লুট্রিস। বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে ল্যাটাক্স লুট্রিস। এদের চেহারা বেশ নধর ও গোলগাল। ওজনেও ভারী। লেজ অপেক্ষাকৃত ছোটো। অসম্ভব ভালো সাঁতারু। এরা সমুদ্রে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। ডাঙ্গায় উঠলেও তা অল্প সময়ের জন্য। সাগরের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে বহুদূর চলে যায়। এদের প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায় আলাস্কা দ্বীপপুঞ্জে। এদের প্রধান খাদ্য মাছ। কাঁকড়াও ভালোবাসে। এদের শরীরের লোম গাঢ় বাদামি রঙের। এই লোম অত্যন্ত দামি বলে এদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। সামুদ্রিক ভোঁদড়কে 'পরিবেশ বন্ধু' বলা হয়।

ভোঁদড়ের পিতৃ-মাতৃ স্নেহ তুলনাহীন। মা-বাবার পিঠে চড়ে ঢেউয়ে ভাসতে শেখে শিশু ভোঁদড়। বাবা ভোঁদড় মাছ ধরে মুখে নিয়ে চিৎ হয়ে ভাসতে থাকলে শিশুটি মায়ের পিঠ থেকে নেমে লাফ দিয়ে বাবার বুকে এসে পড়ে। মা-বাবা দুজনেই সাঁতার কাটা ও শিকার ধরতে শেখায়। দু'তিন মাসের মধ্যেই সাঁতার ও শিকার ধরা শিখে যায়। দু'বছর পর্যন্ত বাবা-মায়ের সঙ্গেই থাকে। কখনো শিকার করতে না পারলে শিশুরা কাঁদতে থাকে। মা ভোঁদড় কান্না সহ্য করতে না পেরে দাঁত দিয়ে নিজের শরীরের মাংস ছিঁড়ে সন্তানদের খেতে দেয়। সন্তানদের জন্য মা ভোঁদড়ের এমন আত্মত্যাগ সত্যিই বিরল। সমগ্র প্রাণীজগতে এমনটা আর কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

তাপস অধিকারী

ভারতের পথে পথে

পিথোরাগড়

১৯৬২ সালে আলমোড়া জেলা ভেঙে পিথোরাগড় জেলার জন্ম হয়েছে। দিগন্ত বিস্তৃত হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি এবং চির ও পাইনে ছাওয়া ১৬৪৫ মিটার উঁচু পিথোরাগড়কে মহিমামণ্ডিত করে তুলেছে। চান্দক, থল, ধ্বজ, কেদার ও কুন্দর—এই পাঁচ পাহাড় ঘিরে রয়েছে পিথোরাগড়কে। এর ৩৩ কিলোমিটার পূর্বে নেপাল ওবং উত্তরে তিব্বত। সীমান্ত জুড়ে রয়েছে দোকানপাট, হাটবাজার। এখান থেকে কৈলাস ও মানস সরোবরে যাওয়া যায়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে গোর্খাদের তৈরি পাহাড়ি দুর্গ এখন তহসিল অফিস হয়েছে। রয়েছে পাতাল ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গ সোমেশ্বর মহাদেব।

অতীতের নানান মন্দির আর তার কারুকার্যের সাক্ষী এই পিথোরাগড়। ৭ কিলোমিটার দূরে চৌখাম্বা, নন্দাদেবী, নন্দাকোট, নন্দাখাত ছাড়াও পশ্চিম নেপালের বহু পর্বত শিখর এখানে থেকে দেখা যায়।

জানো কি?

- ইসরো স্থাপিত হয় ১৯৬৯ সালে।
- ইসরোর প্রতিষ্ঠাতা বিক্রম সারাভাই।
- ইসরোর বর্তমান চেয়ারম্যান ড. কে শিবান।
- চন্দ্রযান-২ প্রেরণ করা হয় ২০১৯ সালে।
- ৩৭০ ধারা ও ৩৫এ বাতিলের পর ভারতে এখন রাজ্য২৮ টি এবং ৯ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ।
- লাদাখ ও জম্মু-কাশ্মীর এখন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল।
- লাদাখে জেলার সংখ্যা ২ টি এবং জম্মু-কাশ্মীরে ২২ টি।

ভালো কথা

নাগরিকতা

উত্তর দিল্লির মঞ্জু কা টিলার হিন্দু উদ্বাস্তু কলোনির একটি বাড়িতে আনন্দের ঢেউ। কারণ একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়েছে। সেটি আবার লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার আগের দিন। পরেরদিন যখন তারা জানতে পারলেন যে লোকসভায় বিল পাশ হয়ে গেছে, তখন তারা ওই সদ্যোজাত কন্যার নাম রাখলেন 'নাগরিকতা'। ২০১২ সাল তারা পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে দিল্লিতে তাঁবু খাটিয়ে, মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘর বানিয়ে থাকতে শুরু করেন। তাদের মতো আরও সাতশো পরিবার ওই উদ্বাস্তু শিবিরে থাকেন। নাগরিকতার মা আরতিদেবী সাংবাদিকদের বলেন, 'সাত বছর ধরে আমরা ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য লড়াই করেছি। মেয়ের জন্মের পর আমরা নিশ্চিত যে, এবার আমরা নাগরিকত্ব পেয়ে যাব।' নাগরিকতার পরিবারের মতো দিল্লির সব উদ্বাস্তুরাই নাগরিকত্ব পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা। তারা সবাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন।

রামকৃষ্ণ পাল, দ্বাদশ শ্রেণী, দিপালীনগর, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

শীতের কাঁপন

মধুমিতা সরকার, একাদশ শ্রেণী, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা।

শীতের কাঁপন লাগায় মাতন
হি হি কাঁপছে দেশ,
গরিবরা খুব কষ্টে আছে
বড়োলোকেরা বেশ।

বড়োলোকের গরম কাপড়
কাবু ঠাণ্ডা হাওয়া,
গরিবদের শুধু আছে রোদ
আর একটু আগুন পোহা।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

SANHIT POLYMER

Sriniketan Road, Bolpur, Birbhum, West Bengal - 731204
Phone : +91+3463-255-560 / 257-769, E-mail : sanhitpolymer@yahoo.co.in
Fax :+91-3463-254215

Factory : Shibtala-Surul Road, Bolpur, Dist. : Birbhum, West Bangal 731204, Phone : +91+3463-234517 / 645017 / 09732024706

APPLICATION

Industry & Packaging

PP - Icecream cup & Cotainer
HDPE LLDPE Tarpaulim
Pond Liner
Pole (Concrite)
Green House

Civil & Construction:

Construction Film for concrete
Separation membrane for Road Construction
Liner for Hazards West Pond
Liner for Water Reservoir
Disposal Glass & Cup

With Best Compliments From :-

MUKHERJEE ENGINEERING CO.

Manufacturer of

R. C. C. SPUN PIPES, COLLARS & ALLIED ITEMS

Head Office & Workshop

Sriniketan Road, Bolpur, Pin - 731 204
Phone : (03463) 254-215 (O), Mobile : 9434009737, 919434762433
E-mail : mukherjeeengineeringco@yahoo.com Fax : 03463-254215

সত্তরতম গণতন্ত্র দিবসে জনগণের কর্তব্য

মণীন্দ্রনাথ সাহা

দেশে সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর দেখতে দেখতে কেটে গেল সত্তরটি বছর। সত্তর বছর আগে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি গৃহীত হয়েছিল ভারতের সংবিধান। সংবিধান রচনা এবং তা রক্ষা করার দায়িত্ব দেশের সাধারণ মানুষের উপর ন্যস্ত হয়েছিল।

স্বাধীনতা লাভ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এত বছর পর নতুন করে ভাবতে হবে কীভাবে দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সাধারণ মানুষের রায়ে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে সংসদে বা বিধানসভায় অধিষ্ঠিত হলেই যে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না— এ কথাটা নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। আর তা না হলে জনগণের কাছে গণতন্ত্র শুধু একটি অলীক স্বপ্নই থেকে যাবে।

বর্তমান সময়ে সংসদ থেকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত সাধারণদের ব্যাপক উপস্থিতি অনেকের মাধাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে সামান্য একজন চাওয়ালা ভারতের মতো বিশাল দেশের গদিতে বসার জন্য। এ তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না।

এই গণতান্ত্রিক কাঠামো জনগণের স্বার্থরক্ষায় অতন্দ্রপ্রহরীর মতো কাজ করে যাচ্ছে। এই গণতন্ত্রের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন বিহারের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর আব্দুল গফুর, মহারাষ্ট্রের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর আব্দুল রহমান আন্তুলে, অসমের সৈয়দ আনোয়ারা তাইমুর। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা হলে এরা কোনোদিন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন না। দলিত নেত্রী মায়াবতী, দরিদ্র ঘরের কন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন না। সহমতের ও নমনীয় গণতন্ত্রের জন্যই তা সম্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে। এই কাঠামোতেই উদ্বাস্তু আই কে গুজরাল প্রধানমন্ত্রী হন, উদ্বাস্তু আদবানী উপ-প্রধানমন্ত্রী হন, অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের সন্তান চা-র বিক্রেতা নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হন, উপজাতি সাংমা লোকসভার অধ্যক্ষ হন। তপশিলি কে আর নারায়ণন রাষ্ট্রপতি হন, মুসলমান ফকরুদ্দিন, জাকির হোসেন, এপিজে আবুল কালাম রাষ্ট্রপতি হন, খ্রিস্টান ফার্নান্ডেজ প্রতিরক্ষামন্ত্রী, পারসি সোলি সোরাবজি অ্যাটর্নি জেনারেল হন। সর্বোপরি সংবিধান রচনা করার খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান হন দলিত আম্বেদকর। এর পরে আর বলা যায় না গণতন্ত্রে জনসাধারণ অবহেলিত, বঞ্চিত।

তবে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে যাঁরা বিধানসভা বা সংসদে যান, রাজনীতির গতিপ্রকৃতির উপরই তাঁদের ক্ষমতা নির্ভর করে। গণতন্ত্রে শাসক ও বিরোধী দুই পক্ষেরই ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। দেশে দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা কায়েম করার জন্য দু' পক্ষকেই নিতে হয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু ভারতের সাংসদ বা বিধায়করা জনগণকে সুশাসন দেবার পরিবর্তে নিজেদের ক্ষমতা লাভ এবং দীর্ঘ সময় তা ভোগ করার বিষয়েই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন। সাধারণ মানুষের রায়ে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে সংসদে বা বিধান সভায় অধিষ্ঠিত হলেই যে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না— একথা নতুন করে বোধহয় ভাববার সময় এসেছে।

আজ ভারতীয় গণতন্ত্র যখন সত্তর বছর অতিক্রম করছে তখন আমরা পিছনে তাকিয়ে দেখি কতদূর এগিয়েছি। কৃষিতে, শিল্পে, সমাজ কল্যাণে, খাদ্যের নিরাপত্তায়, দুর্বল ও দলিতদের যত্নে দেশ পথিকৃতের উদ্যোগ নিয়েছে। জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমরা অন্তরীক্ষে হাত বাড়াতে কোনও বাধার তোয়াক্কা করিনি। মহাসমুদ্রের গভীরে ঝাঁপ দিয়েছি এবং আই টি ক্ষেত্রে নতুন নতুন উচ্চতায় পৌঁছে বিশ্বজুড়ে সফ্‌টওয়ার পাওয়ার হাউস নামে অভিহিত হয়েছি। এই সব কিছুই সম্ভব হয়েছে তার কারণ আমরা জনশক্তিকে যুক্ত করে নিয়েছি। ভারতীয় গণতন্ত্র সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বমূলক এবং তৃণমূল স্তর পর্যন্ত অংশগ্রহণমূলক রূপে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, সংবিধানে স্থাপিত সেইসব মহান আদর্শকে পূরণ করছে— ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শকে, যা আমাদের গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি।

গণতন্ত্র দিবসে সৈনিকরা যখন জনগণের হর্ষধ্বনির মধ্যে দিয়ে কুচকাওয়াজ করেন, ট্যাবলোগুলো যখন বৈচিত্র্য আর ঐক্যকে পরিস্ফুট করে, তখন গর্বে আমাদের বুক ভরে ওঠে। তবে নানা দিকের ব্যর্থতার কথা অবশ্যই তোলা যেতে পারে, সেসবের অনেকটাই মামুলি অভিযোগ। যেমন, এখনও ভারতের সব মানুষ পেট ভরে খেতে পায় না, পানীয় জলের অভাব, মাথার উপর সকলের ছাদ নেই, লেখাপড়া থেকে অনেকেই বঞ্চিত, সকলের কাজ জোটে না। এই অভিযোগগুলো সত্য বটে, কিন্তু সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রকে অভিযুক্ত করা যায় না।

সে সবই মানসিক ব্যর্থতা। দায়িত্বে আছেন কিন্তু দায়িত্ব পালন করছেন না, ক্ষমতা হাতে পেয়ে শুধু নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করছেন— এই মানবিক দোষ ও দুর্বলতা দেশের পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। এই অভিশাপ গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত করে, জনগণের বঞ্চনা বাড়ায়। এখনও যে হাহাকার শুনি তবে তার উৎস সেখানেই। কিন্তু এও শেষ কথা নয়। জনগণের আত্মচেতনা বাড়তেই থাকবে। তারাই গণতন্ত্রকে জীবন্ত ও নিষ্কলুষ করে তুলবে। মহান গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আমি প্রণাম জানাতে হয় আমাদের গণতন্ত্রের প্রহরী প্রকৃত দেশভক্ত জনগণকে।

ফঃ ৬

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :-

ASHOKA TOOLS PVT. LTD.

MECHANICAL & STRUCTURAL ENGINEERS

email : ashokatools@hotmail.com

-: REGD. OFFICE :-

23A, Netaji Subhas Road,

11 th Floor, Room No. 31,

Kolkata-700 001

Phone No. 9331229004

-: FACTORY :-

Santra para, Par Dankuni

Hooghly, Pin- 712310

PHONE : OFFICE : 2231-9166/

PH. 9903853534

With the best Compliments from :

JALAN CHEMICAL & INDUSTRIES PVT. LTD.

Director : Rajesh Jain

27AB Royd Street, Ground Floor

Kolkata-700016

Phone : 22297263

স্বস্তিকার পূর্বতন সম্পাদক অসীম কুমার মিত্রের জীবনাবসান

প্রয়াত হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক, বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক, সুবক্তা এবং স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক অসীম কুমার মিত্র। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩। রেখে গেলেন সহধর্মিণী, ১ পুত্র ও পুত্রবধূ-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে। বিগত বেশ কয়েকদিন ধরেই তিনি হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন। বছর দুয়েক আগে তার হার্ট অপারেশন হয়। দিন পনেরো আগে তিনি পুনরায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান। তাঁকে টালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে আর এস ভি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি কয়েকদিন আগে কোমায় চলে যান। শেষ পর্যন্ত কলকাতা প্রেসক্লাবের চেষ্টায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ১২ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ন'টায় সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন তাঁর অবস্থার খবর নিতে হাসপাতালে ফোন করেন।

তিনি শৈশবকালে বাবার হাত ধরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। তিনি ক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ-সহ সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে সাপ্তাহিক 'অর্গানাইজার' পত্রিকায় কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ঘটনা ভিত্তিক প্রতিবেদন লিখেছেন। তিনি কন্যাকুমারীতে স্বামী বিবেকানন্দ শিলা স্মৃতিসৌধ নির্মাণে একনাথ রানাডেকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছেন।

তিনি স্বর্গীয় অমিয়কান্তি মিত্রের সুপুত্র। অসীমবাবু কর্মজীবন শুরু করেন 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এ। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। সাব এডিটর হিসেবে 'যুগান্তর' পত্রিকায় যোগ দেন ১৯৬৯-এ। ১৯৮১ সালে আজকাল পত্রিকায় যোগ দেন। সেখান থেকে সিনিয়র অ্যাসিস্টেন্ট এডিটর হিসেবে ১৯৯৯ সালে অবসর নেন।

এক সময় 'স্বস্তিকা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অসীম মিত্র। তিনি প্রায় আড়াই বছর বাংলা সাপ্তাহিক স্বস্তিকার সম্পাদক ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে স্বস্তিকায় তিনি 'অগ্নিশর্মার কলম' লিখেছেন। 'যুগশঙ্খ' পত্রিকাতেও বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে দু' দশকের বেশি অতিথি অধ্যাপক হিসেবে তিনি কর্মরত ছিলেন। চারটি বইও লিখেছেন। সর্বভারতীয় সাংবাদিক সংগঠন ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টের রাজ্য সভাপতি এবং প্রেস কাউন্সিল, ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্য ছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি নিবেদিতা মিশন ট্রাস্টের সভাপতিও ছিলেন। নিয়মিত লেখক ছিলেন দিল্লি থেকে প্রকাশিত অর্গানাইজার ও পাঞ্চজন্য পত্রিকারও।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও তিনি টেকনো ইন্ডিয়ার মাস কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট, ঝাড়খণ্ডের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, মাখনলাল চতুর্বেদী ইউনিভার্সিটি অব জার্নালিজম, পুনে ইউনিভার্সিটি-সহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি সংবাদপত্রের ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তিনি পালেকর অ্যাওয়ার্ড রূপায়ণ কমিটি, নিউজ প্রিন্ট অ্যাডভাইসারি কমিটি, প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল প্রেস অ্যাক্রিডিটিয়েশন কমিটির সদস্য ছিলেন।

তিন দফায় তিনি ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট-এর সভাপতি ছিলেন। ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। পাঞ্চজন্য পত্রিকা আয়োজিত সাংবাদিকতায় সেরার সম্মান 'নচিকেতা সম্মান' গ্রহণ করেন ২০০১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর হাত থেকে। ২০০৫ সালে অশোক সিংহলের হাত থেকে গ্রহণ করেন 'বাপুরাও লেলে' অ্যাওয়ার্ড।

১৯৭৫ সালে সংবাদমাধ্যমে সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য তিনি তিন মাস কারাগারে ছিলেন। সম্পাদক হিসেবে তিনি সাংবাদিকতায় উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

এদিন কিছুক্ষণ প্রেস ক্লাবে তাঁর মহদেহ শায়িত রাখা হয়। রবীন্দ্র সংগীতের মাধ্যমে ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রদ্ধা জানানো হয়। কলকাতা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি স্নেহাশিস শূর, সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক এবং হীরক কর পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধা জানান। হিন্দুস্থান সমাচারের পক্ষে অন্যতম ডিরেক্টর রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। শোকপ্রকাশ করেন হিন্দুস্থান সমাচারের বর্তমান ব্যুরো চিফ সন্তোষ মধুপ। তাঁর বাড়িতে গিয়ে মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান স্বস্তিকার প্রাক্তন সম্পাদক বিজয় আঢ্য। তাঁকে শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন সংগঠন ও সাংবাদিকরা। প্রেসক্লাব থেকে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বেহালার বাসভবনে। সন্ধ্যায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ■

With Best
Compliments From :-

ASHOK AGARWALA

PRAGATI IMPEX PVT. LTD.

5, Clive Row, 2nd Floor,
Room No. 41
Kolkata - 700 001

DAYAL INDUSTRIES

DAYAL GROUP

MAKER OF INDUSTRIAL BLADES

Works
GOPALPUR HOUSE P.O. : R. GOPALPUR
GOPALPUR, 24 PARGANAS (North)
PIN-700 136

Office :
3, Synagogue Street,
Room No. 12, 2nd Floor, Kolkata 700 001
PHONE : 22424296/22434571, 033-22421761

দত্তপুকুরে দলবদ্ধ হামলায় আতঙ্কিত মানুষ

সংবাদদাতা।। সেই একই আতঙ্ক, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, হানাদার বাহিনীর আক্রমণ, রাত পাহারা এসব ঘটনা উদ্বাস্তুদের ৭১ সালের পূর্বপাকিস্তানের লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়ে দিচ্ছে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত বৃহত্তর দত্তপুকুর অঞ্চলের মানুষদের। ৭১ সালের পরেও স্বাধীন বাংলাদেশে বারবার ঘটতে থাকা সংখ্যাগুরুদের হিংস্র আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘরবাড়ি, জোত-জমি, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরিবাকরি— এক কথায় সোনার সংসার ফেলে অনেকেই প্রায় একবস্ত্রে চলে এসেছিলেন এপারে শুধুমাত্র ধর্মরক্ষা আর নিরাপত্তার আশায়। কিন্তু এখানেও সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি, তাই অনেকের মনে এই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে এবার যাবো কোথায়?

ঘটনার সূত্রপাত ৩১ ডিসেম্বর বর্ষশেষের রাতে। স্থানীয় দত্তপুকুর হাটখোলার কাছে লোকনাথ মন্দিরে প্রতি বছরের মতো এবারেও সপ্তাহব্যাপী মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। ৩১ ডিসেম্বর মেলার শেষ দিন। মেলায় প্রসাধনী সামগ্রীর দোকান দিয়েছিল স্থানীয় নরসিংহপুর গ্রামের বাসিন্দা আসাদুল ইসলাম (৩০)। সে এক স্থানীয় তরুণীর সাথে অভব্য আচরণ করে বলে অভিযোগ। তাই তাকে ক্লাবে ডেকে নিয়ে মেলার উদ্যোক্তা এবং দত্তপুকুর-২ গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান মান্তু সাহা এবং তার সহযোগী লাল্টু সাহারা মারধর করে ক্লাবে আটকে রাখেন বলে অভিযোগ।

কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে দেখা যায় আসাদুল গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। অন্য একটি সূত্রে জানা যায় তৃণমূল নেতা মান্তু সাহা এবং লাল্টু সাহারা দোকানের জন্য অনেক বেশি টাকা দাবি করে, না পেয়ে তাকে পিটিয়ে মারে। এই খবর প্রকাশ হতেই পার্শ্ববর্তী মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামগুলি থেকে অসংখ্য মানুষ বেরিয়ে এসে তাণ্ডব শুরু করে। লোকনাথ মন্দির এবং অস্থায়ী প্যান্ডেল ভেঙে ফেলে। দত্তপুকুর হাটের হিন্দুদের দোকানগুলিতে ব্যাপক লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ শুরু হয়।

স্থানীয় মসজিদগুলি থেকে ইমামরা মাইকে প্রচার শুরু করে— মুসলমান-ভাই নিহত হিন্দুদের হাতে। মুসলমানরা আক্রান্ত, তাই সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রতিরোধে শামিল হতে হবে। ইমামদের এই আবেদন আগুনে ঘৃতাহুতি দিল। হাজার হাজার মুসলমান যশোর রোড অবরোধ করে তাণ্ডব শুরু করে। রেল অবরোধ শুরু হয়। এবারে জাতীয়তাবাদী জনতা পথে নেমে প্রতিরোধ শুরু করে। দলমত নির্বিশেষে স্বতস্ফূর্ত প্রবল প্রতিরোধে জেহাদি বাহিনী এবার পিছু হঠতে বাধ্য হয়। প্রচুর পুলিশ এবং র‍্যাফও এবার পথে নামে।

ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবুও মুসলমানদের কাছ থেকে হুমকি আসতে থাকে। হিন্দু এলাকাগুলিতে রাত পাহারা শুরু হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে যুবকদের প্রতিরোধে শামিল হতে দেখা যায়। পুলিশ, আরপিএফ অতি সক্রিয় থাকায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া লোকনাথ মন্দির চত্বরে কাউকে যেতে কিংবা ছবি তুলতে দিচ্ছে না। চাপা উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি এখন মোটামুটি শান্ত। শান্তিপ্রিয় মানুষদের আশঙ্কা, প্রতিরোধ শিথিল হলেই আবার জেহাদি আক্রমণ শুরু হবে। অনেককে বলতে শোনা যাচ্ছে ফোর্স চলে গেলেই বদলা শুরু হবে। স্থানীয় স্কুলগুলিতে পুলিশ, আরপিএফ ক্যাম্প করে থাকায় বছরের শুরুতে পঠনপাঠন বিঘ্নিত হচ্ছে। আর আতঙ্ক তো পিছু ছাড়ছেই না। তবে মোক্ষম কথাটি বলেছেন এক মাঝ বয়সী উদ্বাস্তু, রাত পাহারা দিয়ে এসে তিনি বললেন— আমরা তো ভালো খাওয়া-পরার জন্য এদেশে আসিনি। এসেছি ধর্মরক্ষা আর নিরাপত্তার জন্য। সেটাই যদি না থাকে তবে এদেশে আসা কেন? ভালো খাওয়া-পরার অভাব তো ওদেশে ছিল না। এখন আমাদের ধর্মরক্ষা আর নিরাপত্তাকে খাটো করে শুধু আলু পেঁয়াজের দাম দেখানো হচ্ছে। নিরাপত্তা কোথায়?

জেহাদি তাণ্ডবে তছনছ লোকনাথ মন্দিরের প্যান্ডেল।

With Best Compliments From :-

A

Well

Wisher

Baijnath Shreelal

-: Mfgs. of :-

Handloom Silk,
Furnishing Cloth and
Cotton Dress
Materials

Head Office
Nathnagar, Bhagalpur (Bihar)

Branch Office
193/1, Mahatma Gandhi Road
Kolkata - 700 007
Mobile : 9831126557

ACC LOGISTICS

Fleet Owners & Transport Contractors

Registered Government Contractor

40, Girish Park (North),
1st Floor, Suit # 01
Kolkata - 700 006
(Near Calcutta Medicos)

An ISO 9001:2008 Company

Phone : +91 33 2530 7780 / 81, E-mail : ashok@acclogistics.in
URL : www.acclogistics.in

অগ্নিগর্ভ পশ্চিমবঙ্গ
মালদার সুজাপুরে জেহাদি তাণ্ডব

সংবাদদাতা।। গত ৮ জানুয়ারি নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে বিরোধী দলগুলো ভারত বনধের ডাক দিয়েছিল। সেদিন মালদা জেলার কালিয়াচকের সুজাপুরে জেহাদিদের তাণ্ডবে রাস্তা অবরোধ, সরকারি বাস ভাঙচুর, অ্যাম্বুলেন্স আটকে মরণাপন্ন রোগীকে কলকাতা যেতে বাধা দেওয়া এবং পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগানোর মতো ঘটনা ঘটেছিল। জেলা পুলিশ সুপার এই ঘটনার তদন্ত করার কথা বললেও বাস্তবে কী হবে তা সবাই জানে। বেশ কয়েক বছর আগে এই কালিয়াচকেই জেহাদিরা থানা জ্বালিয়ে অস্ত্র লুটপাট করেছিল। আশ্চর্যের বিষয়, রাতারাতি সেই থানা কোনো তদন্ত ছাড়াই ঝাঁ চকচকে করা হয়েছিল। অনুরূপ ভাবে অতি সম্প্রতি ২৪ পরগনার নৈহাটিতে একটি বাজি কারখানায় শক্তিশালী বিস্ফোরণের পর প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। সেই সময় বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তদন্ত করার কথা বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

নৈহাটির বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় রাজ্যপাল বিশেষজ্ঞ দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে একদম সঠিক কাজটি করেছেন। কেননা ৯ জানুয়ারি বিস্ফোরক দ্রব্য নষ্ট করতে গিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে গিয়েছিল নৈহাটি ও গঙ্গা পারের লোকালয়। অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন ও আতঙ্কে বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

দেখা গেছে, এর আগেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বাজি কারখানার আড়ালে বোমা তৈরি করার প্রমাণ মিলেছিল। শুনতে অপ্রিয় হলেও রাজ্য সরকারের তুষ্টিকরণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ, বারাসাত, ক্যানিং, বর্ধমানের খাগড়াগড়-সহ প্রায় প্রতিটি জেলায় আজকে বোমা তৈরির ছোটো ছোটো কারখানা গড়ে উঠেছে। পুলিশ ও প্রশাসনের উদাসীনতা এবং রাজনৈতিক নেতাদের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে এই রাজ্যে আজ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে, যার দরুন দুষ্কৃতকারী ও অপরাধীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যপালের সাংবিধানিক অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে, তিনি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তদন্ত কমিটি গঠনের কথা বলতেই পারেন। তাছাড়া রাজ্যপাল মন্ত্রীসভার হাতের পুতুল নন যে চোখ-কান বন্ধ করে অন্যায়কে মেনে নেবেন। তিনি সক্রিয় হওয়াতে মুখ্যমন্ত্রীর অসুবিধা হচ্ছে। কেননা মুখে শান্তি ও গণতন্ত্রের কথা বললেও আচরণে তিনি স্বৈরতন্ত্রের পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শন করছেন। যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কের ভিতর তিক্ততা কাম্য নয়। নাগরিকত্ব আইন কার্যকর হওয়ার পর দেখা গেল টানা একসপ্তাহ ধরে রাজ্যে নির্বাচিত সরকারের চোখের সামনে কোটি কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বিনষ্ট করার পরেও জেহাদিদের কোনো প্রকার শাস্তি না দিয়ে মমতা প্রমাণ করে দিলেন তাঁর কথাই শেষ কথা। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা ব্যানার্জি সংবিধানগত ভাবে শপথ নিয়েছেন যে, তিনি সততার সঙ্গে রাজধর্ম পালন করবেন। অর্থাৎ রাজ্যের জনগণকে প্ররোচিত বা বিভ্রান্ত করার মতো কোনো কাজ করবেন না। কিন্তু এই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি এই দুটি কাজই করছেন। অথচ আর এক রাজ্য উত্তরপ্রদেশে দুষ্কৃতকারীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বুঝিয়ে দিলেন, আইনের শাসন কাকে বলে! এ প্রসঙ্গে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও বলেছিলেন, আন্দোলনের নামে যারা জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংস করবে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে তিনি অনুপ্রবেশকারী ও জেহাদিদের সমর্থনে রাস্তায় নেমে পড়েছেন। এতে সারা দেশের নজর এই রাজ্যের উপর এসে পড়েছে। গোয়েন্দাদের সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, এই রাজ্যে যেসব ধ্বংসাত্মক ও হিংসাত্মক কর্মসূচির মাধ্যমে রেললাইন উপড়ে ফেলা, ট্রেন ও রেলস্টেশন পুড়িয়ে দেওয়া, ডজনখানেক বাস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে তার পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র ও বিদেশি শক্তির হাত রয়েছে। এন আই এ-কে দিয়ে তদন্ত করালেই সত্যতা উন্মোচিত হবে। অতীতে মালদা ও বর্ধমানের বিস্ফোরণ ঘটানোর পেছনে বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনের হাত থাকার খবর পাওয়া গেছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ওড়িশার কিছু অংশ নিয়ে গ্রেটার ইসলামিক বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন গোয়েন্দারা। সুতরাং যেভাবে এরাজ্যে জেহাদি ও উগ্রবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতার নামে অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি করে এক সম্প্রদায়ের মানুষকে খেপিয়ে তুলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টা হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে দেশভাগের পূর্ববর্তী সময়ের সেই কালোদিন আবার ফিরে আসছে।

সুজাপুরে জেহাদি তাণ্ডবে জ্বলছে গাড়ির সারি।

With Best

Compliments
From

Punjab Glass Depot

OMEX (INDIA) SALES PVT. LTD.

Earth Moving, Mining, Auto &
General Machinery Spares

6, Mangoe Lane, 2nd Floor,
Kolkata - 700 001

Phone : 2210-3267, 2248-0761

Fax : 22102969,

E-mail : omexindi@cal2.vsnl.net.in

With Best Compliments
From :-

Hommage Commercial L.L.P.

M. E. M. INDUSTRIES

AN ISO 9001 : 2008 Company

e-mail : cables@memindustries.com
Poddar Court, Gate no. 4, 2nd floor,
18, Rabindra Sanani,
Kolkata-700 001,
Phone : 22357998, 22352996,
Telefax : 033-22351868

OUR RANGE

- Compensating Cables
- High Temperature Cables
- Instrumentation Cables
- Trailing Rubber Cables
- Control & Frls Cables
- Thermocouples & RTD

Also Sole Distributor
BELDEN (USA)Cables.